বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

সমবায়

নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা

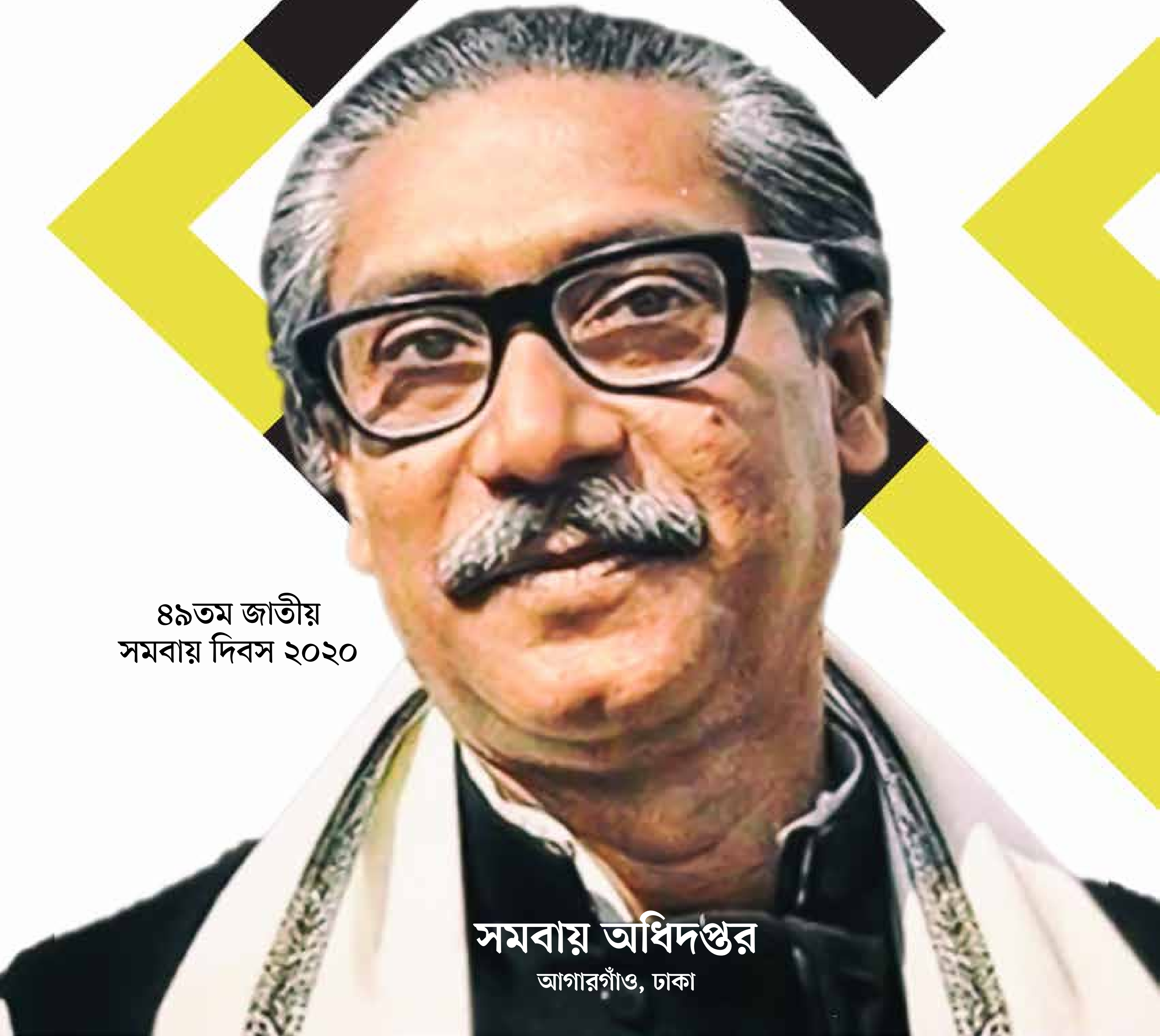

৪৯তম জাতীয়
সমবায় দিবস ২০২০

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

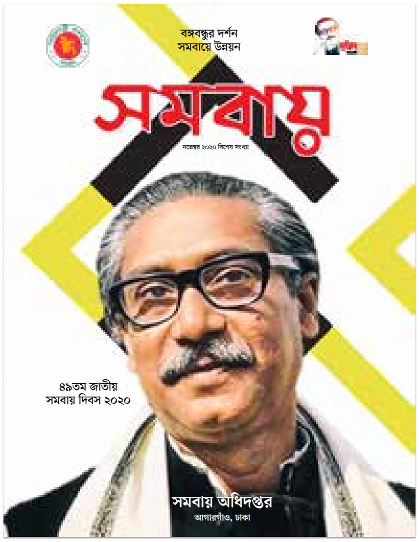

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

প্রকাশকাল
৭ নভেম্বর ২০২০, ২২ কার্তিক ১৪২৭

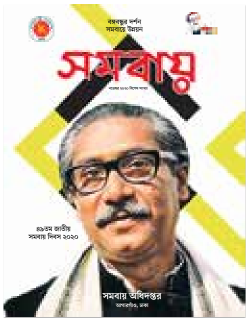

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ রিয়াজুল কবীর
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি/পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২২ কার্তিক ১৪২৭
০৭ নভেম্বর ২০২০

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন এ আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমবায়ের চেতনাকে প্রবল ও অর্থবহ করে তুলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সংবিধানে মালিকানার নীতি হিসাবে সমবায়কে জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একটি শ্রেণী-গোষ্ঠীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সমবায় একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান। সমবায় পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও ভাগ্যোন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাস করে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। তাই কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি গঠনে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমবায়ের মাধ্যমে আয়-বৈষম্য হ্রাস করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সক্রিয় এবং যুগোপযোগী করতে সংশ্লিষ্ট সকলে তৎপর ও আন্তরিক হবেন-এ প্রত্যাশা করি।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন সফল হোক-এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ কার্তিক ১৪২৭
৭ নভেম্বর ২০২০

বাণী

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়বান্ধব জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। আজকের মিল্কভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল। জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত/যৌথ খামার প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লী-উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করি এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তরিত করি। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-পুরুষ সমতার উদ্দেশ্যে পল্লী-দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ প্রণয়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করি। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করি। পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'আমার বাড়ী, আমার খামার প্রকল্প' গ্রহণ করি। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ১৪২টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, যার উপকারভোগী সদস্য পরিবার-৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধি করেছি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছি, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সমিতি ১,৯০,৫৩৪টি এবং সদস্য ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জনে উন্নীত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোশাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামড়াজাত-মৃৎশিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে। এ বছর কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বে স্থবিরতা সৃষ্টি করলেও, আমাদের সমবায় সমিতিগুলো এ সময় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সদস্যদের ঋণ মওকুফসহ দুর্গত সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে। করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। আমাদের সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ধরনের গণমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে করোনা-মহামারি থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীগণকে ২০১৯ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান নিশ্চয় দেশের সকল সমবায়ীকে আরও উৎসাহিত করবে।

আসুন, জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে 'সমবায়ের জাদুস্পর্শে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মূল্যবোধের চর্চা ও সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করে আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।' ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক। সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

৭ নভেম্বর, ২০২০ ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস। দিবসটি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের এ শুভক্ষণে আমি দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়মনস্ক জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ- ২০২০' উদযাপনের অংশ হিসেবে এ প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণসহ সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সমবায় পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও ভাগ্যোন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাস করে। সমবায় হল সমবায়মনস্ক একটি শ্রেণি-গোষ্ঠীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে পরিচালিত কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমবায়ের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। কারণ সমবায় সম্পদের সুষম বণ্টন, সুযোগের সমতাবিধান, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এ জন্য বর্তমান সরকার সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তাবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমবায় সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আমি সমবায় আন্দোলনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

আমি ৪৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি)

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২০ সারাদেশে একযোগে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এ প্রতিপাদ্য জাতির পিতার সমবায় দর্শনের যথাযথ প্রতিফলন মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। জাতির পিতা সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনি ভাবতেন সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন করলে উৎপাদন বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর এ দর্শন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লাকসাম ও বগুড়ায় দুইটি প্রকল্প সফল বাস্তবায়নে অভুতপূর্ব ফলাফল এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের সমবায়ীরা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

সমবায় পদ্ধতির শিক্ষা হলো সকলের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলের যুগপৎ উন্নয়ন। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।

'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা-সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন'। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা এখানেই নিহিত রয়েছে। আমি ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল সমবায়ীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

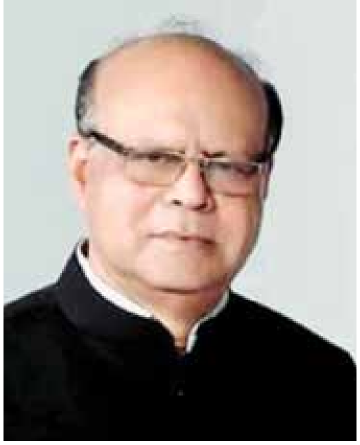

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'- সমবায়ীদের কর্মচাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনার আলোকে দেশ গঠনে অনুপ্রেরণা জোগাবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও দক্ষ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। এ অগ্রযাত্রায় সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এ দেশ হতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে সমবায় আন্দোলনের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে সত্যিকার সোনার বাংলা গঠন। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগকে জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন করতে। তাই দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, "ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি"।

কৃষিঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে এ উপমহাদেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। মূলতঃ কৃষিঋণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ের সূচনা হলেও বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল সেক্টরে সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। সমবায় হলো অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের এক ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস। দেশের পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন লালন করে অংশগ্রহণমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিত্তিক সমবায় ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' ধারণায় গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-২০১৯ বা করোনা ভাইরাসের এ দুঃসময়ে সমবায় সমিতিগুলো সামাজিক অঙ্গীকার পালন করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে ৯৭৭টি সমবায় সমিতি প্রায় ২ (দুই) লক্ষ অসহায় মানুষের সহায়তায় সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ১০ (দশ) কোটি টাকা মূল্যের ত্রাণসামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে।

জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হবে এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি

মোঃ রেজাউল আহসান

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২২ কার্তিক ১৪২৭
৭ নভেম্বর ২০২০

বাণী

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার জাতীয় সমবায় দিবস পালন করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় আজ ৭ নভেম্বর, ২০২০ শনিবার ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস। 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য- যা বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ভাবনারই প্রতিফলন। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নত বাংলাদেশ গঠনে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের এ মহালগ্নে স্লোগানটি সমবায়ীদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করবে এবং নব উদ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে মর্মে আমাদের প্রত্যাশা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গঠনে এদেশে কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও শিল্প উদ্যোগ সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা সমবায়ের মাধ্যমে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তাই ১৯৭২ সালের ৩০ শে জুন জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সম্মেলনে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন-"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।" সমবায়কে অগ্রাধিকার দিতেই তিনি সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে একে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সকল দেশেই সকল যুগেই সমবায় অনস্বীকার্য। সমবায়ের কার্যক্রম বাংলাদেশেও শতাব্দী প্রাচীন। যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে ২৯টি ক্যাটাগরীর অধীনে সমবায় ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমবায় পদ্ধতির শিক্ষা হলো সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলের যুগপৎ উন্নয়ন। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের সমবায়ীরা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারি-বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি প্রয়োজনীয়। এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সীমিত সম্পদ দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো। এ পরিস্থিতিতে একমাত্র বিকল্প হতে পারে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বণ্টন। এতে পণ্যের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী না থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ন্যায্যমূল্যও পাবেন। সমবায়কে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের পথ সুগম করে একটি সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন সাধনে প্রয়োজন সম্পদের সুষম বণ্টন। সুযোগের সমতা বিধানে সমবায় একটি সম্ভাবনাময় শক্তি।

"ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুর স্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি"- জাতির পিতার এই সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন ভাবনায় মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমবায়ভিত্তিক 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠার পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব আজ ভয়াবহ কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত মহামারির কবলে বিপর্যস্ত। দেশের অসংখ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান এ দুর্যোগে স্ব স্ব সমিতির পক্ষে দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করে একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আমি আশা করি, সমবায়ের আর্দশ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোন দেশ ও জাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি ৪৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

(মোঃ রেজাউল আহসান)

মোঃ আমিনুল ইসলাম

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।
২২ কার্তিক ১৪২৭
০৭ নভেম্বর ২০২০

নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের কথা

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে, আয়/ দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র-- সমবায় সমবায়!'--জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই মহান আহ্বান হৃদয়ের গভীরে শুনেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের পিছিয়ে-থাকা-মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেছে দেশের সমবায়-কার্যক্রম। বর্তমানে চলছে 'মুজিব শতবর্ষ'। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা সমবায় অধিদপ্তর গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি একাধিক জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০- এর প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছি : 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'।

বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে সামনে নিয়ে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর ও তাদের জীবনমান-উন্নয়নে সমবায়কে বেগবান করে তোলার নির্দেশনা ও নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন। সেই নেতৃত্ব ও নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে এবং গ্রামের মানুষের সমষ্টিগত সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলে তাদের নিজেদের মাধ্যমেই নিজেদের প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে আমরা গ্রহণ করেছি, 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প'।

বর্তমানে দেশে ১,৯০,৫৩৪ টি সমবায় সমিতির প্রায় এক কোটি পনের লক্ষ সদস্য আছেন। কৃষি-উৎপাদন, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, আবাসন, কর্মসংস্থান, মৎস্য ও দুগ্ধ উৎপাদন ইত্যাদিসহ অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমবায়ের সহযোগী অবদান রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাথমিক সমবায়ীদের প্রায় ২৩% মহিলা, যারা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। করোনা মহামারির প্রথম চারমাসে দেশের ৯৭৭টি সমবায় সমিতি দুর্গত সদস্যদের মাঝে প্রায় ১০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। অনেক সমিতি প্রদত্ত ঋণের সুদ মওকুফ করেছে। অধিকন্তু সমবায় সমিতিগুলো করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে। জুলাই ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে ১,৩৭,৮৫০টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। এটি উন্নয়নের পন্থা হিসেবে সমবায়ের সাফল্য ও জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করে। আমরা এবছর স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং অতিরিক্ত জাঁকজমক পরিহার করে দেশব্যাপী দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের আয়োজন করেছি।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে সমবায়ী ভাইবোন এবং সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

বাণী

প্রতিবছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ ৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ যা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সমবায় একটি পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সংবিধান-স্বীকৃত কৌশল। নারী-পুরুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করে পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন দৃশ্যমান অবদান রেখে চলেছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন ছিল সমবায়ের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন, অর্থাৎ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণ। এজন্য তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠনের জন্য সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেছিলেন এবং আমাদের পবিত্র সংবিধানে সমবায়ী মালিকানাকে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই তিনি গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ গঠন করার আহবান জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন ও আর্দশ বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা গ্রামের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ‘আমার বাড়ী আমার খামার’, ‘সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি’, ‘সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ’ এবং ‘উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পসহ নানামুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে বেগবান করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবো-এই হোক ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সূচিপত্র

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কিছু কথা : শেখ হাসিনা ১৫

বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু : মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং টেকসই উন্নয়ন : ড. আতিউর রহমান ৩০

সমবায়ই শক্তি : গড়তে হবে গণমুখী সমবায় আন্দোলন : অধ্যাপক আবুল বারকাত ৩৩

গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে সমবায় আন্দোলন : মো. মফিজুল ইসলাম ৩৭

সমবায় : সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান : মিল্টন বিশ্বাস ৪০

জাতির পিতার সমবায় ভাবনা ও কৃষিনীতি ২০১৮ : প্রফেসর এম কামরুজ্জামান ৪৭

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও যৌথ কৃষি খামার প্রসঙ্গে : ড. জাহাঙ্গীর আলম ৫০

করোনা আক্রান্ত কৃষি অর্থনীতি এবং সমবায়ের ভূমিকা :
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ ৫৩

করোনাকালে টিকে থাকার অর্থনীতি ও সমবায় : আবু তাহির মুস্তাকিম ৫৬

পতিত জমিতে খাদ্য উৎপাদনে বঙ্গবন্ধুর ডাক : ডঃ কিউ আর ইসলাম ৫৯

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : হরিদাস ঠাকুর ৬১

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনা ও কো-অপারেটিভ
মডেল ভিলেজ : মোঃ আবুল খায়ের ৬৯

শেখ হাসিনার সমবায় দর্শন : উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় একটি দেবোচিত
চিন্তাধারা : মো. রফিকুল ইসলাম ৭২

বঙ্গবন্ধুর সোনালি স্বপ্ন : তাঁতিদের স্বর্গভূমি সিরাজগঞ্জের তাঁতশিল্পের বর্তমান
দূরাবাস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে উত্তরণের উপায় : সামিউল ইসলাম ৭৫

উৎপাদন, বিপণন ও কর্মসংস্থানে সমবায় সমিতির ভূমিকা : মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ ৭৮

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও সমবায় চেতনা : মোঃ নাসির উদ্দীন ৮১

জীবন ও জীবিকার রোল মডেল সমবায় : রত্ন কান্তি রোয়াজা ৮৬

সম্পাদকীয়

শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তিনি ছিলেন গভীরভাবে সমবায়-বান্ধব মহান নেতা। এ বছর 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে পালিত হচ্ছে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০। বঙ্গবন্ধু এদেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক অগ্রগতির পন্থা হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পরপরই সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন-দর্শন এর পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় কাজ করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। এ সকল কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। বর্তমানে মুজিব শতবর্ষ চলমান। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং সমবায়ভিত্তিক আরও অনেক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সেসব কার্যক্রমের কিছু কিছু ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে; কিছু কিছু বাস্তবায়নাধীন এবং কিছু কিছু বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের কার্যক্রম রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' গ্রহণ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন দর্শন অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদ নির্ভর বিশ্বায়নের যুগে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের টিকে থাকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। পুনশ্চঃ উল্লেখ্য, এ সকল নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক মুক্তি নিশ্চিতকরণ ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রধানতম স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন এবং সমবায় ভাবনাকে দেশের মানুষের মাঝে নতুন করে ছড়িয়ে দেওয়া এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে সমবায় পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যায় দেশের সমবায় সম্পর্কে নিবিড়ভাবে ওয়াকিফহাল ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী গবেষক-লেখক-সমবায়ী-সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাছাইকৃত প্রবন্ধ-নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার পাঠগ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে লাগবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব তাঁদের মূল্যবান বাণী দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁদের লেখায় এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধভাবে সাজানো সম্ভব হয়েছে, তাঁদের প্রতিও আমরা সমানভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু বানান বিভ্রাট ও ছোটখাটো ভুলত্রুটি রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমদের সে অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমরা আশাবাদী।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সম্মানিত সমবায়ী এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের জয় হোক।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কিছু কথা

শেখ হাসিনা

'ছেলে লেখাপড়া শিখেছে আর কি ক্ষেতে কাজ করবে?' পৈতৃক কাজে ফিরে যেতে চায় না। চায় চাকরি।'

কথাগুলো গ্রামের এক পিতা ছেলের চাকরি চাইতে এসে আমাকে বলে গেলেন ।

কথাটা আমার খুবই মনে লাগল। কৃষকের ছেলে, গরিব কৃষক-পিতা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন -চাকরি করবে, সংসারে সচ্ছলতা আনবে এই আশা নিয়ে। আমাদের দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই চাকরি চায়, এর চেয়ে বেশি কিছু তারা ভাবতেও পারে না। সেই ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা বাঙালিদের কেরানি হওয়া শিখিয়ে দিয়েছে, তার বাইরে আর আমাদের দৃষ্টি আমরা ফেরাতে পারলাম না ।

কৃষক পিতার সন্তান লেখাপড়া শিখে আধুনিক প্রযুক্তিতে কীভাবে চাষবাস করা যায়, মাটির গুণাগুণ বিচার, সার প্রয়োগ, গাছের যত্ন, সেচব্যবস্থায় ফসল দ্বিগুণ উৎপাদনে কী কী উপকরণ প্রয়োজন; বাজারজাত করতে কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো চিন্তা করলে দেশের সত্যিই অনেক উন্নতি হতো।

আমাকে যখন এক ছেলের পিতা ছেলের চাকরির কথা বললেন, তখন আমি তাকে ঠিক একথাগুলো বললাম। একটা চাকরি করে কত টাকা বেতন পাবে? কিন্তু এমন কিছু চিন্তা করা উচিত যাতে শুধু নিজে চাকরি করবে না; বরং আর দশটা ছেলেকে চাকরি দিতেও পারবে। পৈতৃক কাজ আরও সুন্দরভাবে করার ব্যবস্থা নেয়া, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি খাঁটিয়ে এ কাজকে যুগোপযোগী করে তোলা, যার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, এটিই তো চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত।

আমরা জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চাই। নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। কিন্তু কি সে শিক্ষা? আমরা অক্ষর জ্ঞান দিচ্ছি। পাশাপাশি কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কোনো কাজই যে খাটো নয়-সে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। গ্রামকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থেনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে

দিতে হবে। কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখে কৃষিকাজকে আরও উন্নতমানের করবে। যে জমিতে ফসল ফলাবে, সে ফসল আরও দ্বিগুণ তিনগুণ কীভাবে করা যায় সে বিদ্যার্জন করবে। এ কাজে সে ছোট হবে না, খাটো হবে না, এতে লজ্জার কিছু নেই। সে শিক্ষা দেয়া উচিত। সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন ।

গ্রামকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার জন্য নতুন নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে। প্রতিটি পরিবার যদি যত্নবান হয়, আধুনিক প্রযুক্তি ও চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে-তাহলে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা অর্জন করতে পারে ।

আমাদের দেশে অনেকগুলো পরিবার নিয়ে গ্রামগুলো গড়ে উঠেছে। অনেক সচ্ছল পরিবার রয়েছে, আবার দরিদ্র পরিবারও আছে। একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যাই বেশি। কিছু মানুষ একেবারেই নিঃস্ব অসহায় আছে, যাদের ঘরবাড়ি জমি জিরেত কিছুই নেই। একটু পিছনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব আমাদের গ্রামগুলো কেমন ছিল। গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তা ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এত সহজ ছিল না। বর্তমানে রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক সহজ হচ্ছে। ফলে মানুষের শহরমুখিতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন। যখন কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়, মানুষ নদীভাঙায় গৃহহারা জমিহারা হয়, জীবন-জীবিকার সন্ধানে গ্রামের মায়া ছেড়ে শহরে চলে আসে। মনে করে বুঝি শহরে গেলে কাজ পাবে, খাদ্য পাবে। যতই দিন যাচ্ছে শহরমুখী হচ্ছে মানুষ। কিছু জমিজমা থাকলেও তা ছেড়ে শহরে চলে আসছে। অনেক সময় পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়েও চলে আসছে। ফলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। অথচ একসময় নিজের গ্রামেই মানুষ জীবন কাটিয়েছে ।

হাজার বছরের ইতিহাসের ধারায় আমাদের দেশের গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে। পূর্বে কাগজের নোটের ছড়াছড়ি তেমনটা ছিল না, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তেমন প্রভাব পড়েনি যতটা পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। সবকিছুই যেন ওলট পালট হয়ে গেল। এমনকি জীবনযাপন, সমাজ-সংস্কৃতি মানুষের সমসাময়িকতাও যেন বদলে গেল।

গ্রামের লোকালয়গুলো গড়ে উঠেছে কয়েকটি বসতবাড়ি ও পরিবারকে কেন্দ্র করে। এক-একটি গ্রামে কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি সকলে মিলেই বসতি গড়েছিল। ফলে একটি সংসারে যে চাহিদা তা গ্রাম থেকেই মিটানোর চেষ্টা হতো। তাছাড়া ছিল বিনিময় ব্যবস্থা, সপ্তাহে দুটো-চারটা হাট কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বসত। আর বেচাকেনা ব্যবসা বাণিজ্য এই হাটগুলোকে কেন্দ্র করেই চলত। এক-একটা পরিবার, পারিবারিক

চাহিদা মোটামুটি নিজের জমি-জমা, গাছ-পালা, বাগান, পুকুর-জলা-ডোবা থেকেই মিটাত। আজকাল যেমন সবকিছুই দোকান বা হাটবাজার নির্ভর, আর কথায় কথায় ক্যাশ টাকা ও বাজারে ছোটা, পূর্বে এত দোকানপাটও ছিল না, নগদ টাকাও না, বাজারে ছোটাও না।

যেমন ধরা যাক, একটি পরিবারের কথা। যে পরিবারের মোটামুটি জমিজমা আছে, বাড়ি, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি আছে, সে পরিবার সংসারের চাহিদা জমিজমা গাছপালা থেকেই মিটাত। কাপড়চোপড় ইত্যাদির কথা যদি বাদ দেই তবে আমরা দেখি দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস যেমন দিয়াশলাই, লবণ, কেরোসিন তেল নগদ পয়সায় কেনা লাগত। তার বাইরে সবই ক্ষেতখামার করেই চালাত ।

বর্ধিষ্ণু কৃষকরা যে চাষবাস করতো তাতে সেই ক্ষেতে বা বাড়িতে কাজ করেই অনেক পরিবার কাজ চালাত। জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করতো চাষের জন্য কয়টি হাল প্রয়োজন। নিজেদের জমি চাষ ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা গ্রামে অন্য পরিবারের জমি চাষের কাজেও এই হাল ব্যবহার করা হতো। পরিবারগুলো সংসারের চাহিদা মিটাতে একে অপরকে সহযোগিতা করতো। একটা আন্তরিক পরিবেশ ছিল। বছরের খোরাকি হিসেব করে গোলায় ফসল রাখা হতো। তাছাড়া বীজধান বড় বড় মাটির মটকায় যত্নসহকারে রেখে দেয়া হতো। ছোট ছোট মাটির কলসিতে রবিশস্য বীজ সংরক্ষণ করা হতো। যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হতে যত্নবান হতো। তখন কিন্তু সবই সরকার করে দেবে এমন কথাবার্তা ছিল না।

সংসারের প্রতিটি জিনিসই কাজে লাগানো হতো। যেমন প্রতিবছরই কিছু গাছ লাগানো হতো। যেমন প্রতিবছরই কিছু গাছ লাগানো, প্রতি মৌসুমে তরিতরকারি চাষ করা হতো। ধানক্ষেত, পাটক্ষেতে মাছ হতো প্রচুর। বিশেষ করে ধানক্ষেতগুলোতে প্রচুর মাছ হতো। অনেক ক্ষেতে কুয়া করা থাকত যেখানে পানি টান দিলেই মাছগুলো কুয়ার পানিতে আশ্রয় নিত। ধান কাটার সাথে সাথে মাছও সংগ্রহ করা হতো। বাড়িতে প্রতিদিন বাজার করার প্রথা চালু ছিল না। বড় বড় মাটির মটকায় মাছ জিইয়ে রাখা হতো। মাছ শুটকি করেও রাখা হতো। এই কুয়া থেকে যখন মাছ উঠত তখন শোলমাছগুলোর মাথা আলগা করা হতো। শুধু মাছগুলো শুটকি দিয়ে রাখা হতো, যা সাধারণত বর্ষার সময় ব্যবহার করা হতো। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ু বাড়ির নারকেল গাছ থেকে ডেউগা কেটে পাতা ছেঁচে শলা ছড়ানো হতো। একটু শুকিয়ে মলা বেধে রাখা হতো। বাড়ির প্রয়োজন মিটত। বাকি পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হতো। বাড়ির গরুর গোবর উঠোন লেপার কাজ, ঘুঁটে বানানো, পাটখড়িতে গোবর লেপে লম্বা লম্বা অনেকটা দেখতে শিক কাবাবের মত (খুব বড় বড় শিক কাবাব আর কি) তৈরি করে শুকিয়ে রাখা হতো।

নারকেল থেকে তেল তৈরি হতো । নারকেল মালা দিয়ে হাত বা চামচ তৈরি হতো। ঠিক

এমনিভাবে প্রতিটি জিনিসই সংসারের কাজে ব্যবহার করা হতো। ঘরের পাশে লাউ কুমড়ার চারা উঠে যেত চালে। আঙিনায় মরিচের গাছসহ তরিতরকারি সংসারের মোটামুটি প্রয়োজন মিটাত। মুরগি, হাঁস, কবুতর পালা হতো যা আমাদের চাহিদা মিটাত। প্রতিটি পরিবারই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চেষ্টা করতো। এখনও গ্রামে অনেক পরিবার পাওয়া যাবে, যে সকল পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলে। আবার অনেক পরিবার জমিজমা ছেড়ে শহরে বসবাস করছে। শহরে বসবাস করার প্রবণতা খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

পূর্বে শহরমুখিতা এত বেশি ছিল না। এক একটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, নিজেদের মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বিনিময় করে চলত। মানুষের জীবনযাত্রাও ছিল সহজ সরল। এখনও বাংলাদেশের মানুষ অল্পতেই তুষ্ট এবং তারা খুবই সহজসরল। সহজসরল এ কারণে বলছি। একজন ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এখন চাকরি চায়। লেখাপড়া এমন কিছু নয়, মাধ্যমিক পাস। আর মাধ্যমিক পাস করেছে কাজেই আর পৈতৃক পেশায় ফিরে যেতে পারে না। কৃষক পিতার ছেলে কৃষিকাজে যেতে অনীহা। এতে নাকি সম্মান থাকবে না। কাজেই চাকরিই একমাত্র পথ। চাকরি চাই।

আমি বললাম-লেখাপড়া শিখেছে ভালো করেছে, চাকরি থেকে তো পৈতৃক পেশা আরও ভালোভাবে করতে পারবে। উন্নতমানের চাষাবাদ করতে পারবে। বাপ যা পারে নাই, ছেলে তা পারবে। বরং কৃষির উপর আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। কত বই, কাগজপত্র বের হয়েছে যা পড়ে কৃষিকাজ আরও ভালোভাবে কী করে করা যায় সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করতে পারবে। ফসল কীভাবে দ্বিগুণ উৎপাদন করা যায়, মাটিতে কোন সার কী পরিমাণ দিতে হবে, গাছের যত্ন কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ভালো জ্ঞান অর্জন করে তা কাজে লাগিয়ে বাবাকে সাহায্য করবে। ফসল উৎপাদন বাড়বে। বাবা যদি মাঠে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সেই পয়সায় পড়াতে পারে, আর সেই মেহনতের পয়সায় পড়ে সেই পেশায় যেতে ইজ্জতে লাগে কীভাবে? মানসম্মান হারায় কীভাবে আমি বুঝি না! আর যে বিদ্যা শিখেছে সে- শিক্ষায় কি-ই বা চাকরি পাবে, কত টাকাই বা বেতন পাবে? পরবর্তীতে আমি যা শুনলাম তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ-এমন একটা চাকরি চায় যেখানে দুপয়সা উপরি কামাই করতে পারে। অর্থাৎ ঘুষের সুযোগ আছে এমন চাকরি! শুনে তো আমি আর এ জগতে নাই। কত সরল আমাদের দেশের মানুষ। কার সামনে কী বলছে সে জ্ঞানও তাদের নেই। আমিই সরকার প্রধান, আমিই খুঁজে দেব ঘুষ প্রাপ্তির সুযোগসহ একটি চাকরি। আমি বাকরুদ্ধ। আমার আর কথা বের হলো না। সত্যিই আমি চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ন্যায়-অন্যায়বোধও কি এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! নৈতিকতাবোধের এত অধঃপতন ঘটেছে। বাপ ছেলের জন্য চাকরি চায়। কেমন চাকরি? যেখানে অন্যায় পথে উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। বাপ হয়ে ছেলেকে বিপথে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে। ‘সদা সত্য কথা বলিবে, সৎ পথে চলিবে’-এ শিক্ষা কি এখন আর দেয়া হয় না? আব্বা সব সময় বলতেন, ‘সত্য কথা বলবে, যদি অপরাধ করো মাফ পাবে কিন্তু একটা মিথ্যা যদি বল কোনো ক্ষমা নেই।’ জীবনের প্রতি পদে চেষ্টা করেছি অক্ষরে অক্ষরে পিতার কথা মেনে চলতে। কিন্তু সে বোধ কেমন হারিয়ে গেছে মানুষের মন থেকে। কবে কখন থেকে এ অধঃপতন শুরু, আর কেনই বা? কী এর কারণ? এ কী দারিদ্র্য? দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েই কি অধোগতি? নাকি দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে? কৃত্রিম চাকচিক্য, জৌলুস অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

ন্যায়নীতি বোধকে ঠেলে দিয়ে মানুষ ছুটছে। ছুটছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে, ছুটছে কৃত্রিমতার দিকে। মৌলিকতা ছেড়ে দিয়ে কৃত্রিমতাকেই বেছে নিচ্ছে, কিন্তু এর পরিণতি যে ভয়াবহ, সমাজে সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত। এ ক্ষতের এখনই চিকিৎসা প্রয়োজন।

অত্যন্ত মন খারাপ নিয়ে ফিরে এলাম রাজধানীতে। কী করা যায়, কিছু একটা করতেই হবে। গ্রামের অধোগতিকে সচল করা প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। আর কৃষিকাজে বিমুখ এই নব্য শিক্ষিত সমাজ যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।এক একটা পরিবার তাদের বাড়িকে যেন এক-একটা খামার হিসেবে গড়ে তোলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে-যাতে পরিবারের সকলেই উৎসাহ পায়। আর দু-পয়সা কামাই করতে পারে যাতে করে গ্রাম ছেড়ে অর্থের অন্বেষণে শহরমুখী হতে না হয়।

গ্রামকে কেন্দ্র করে অর্থেনৈতিক কর্মকাণ্ড অতিদ্রুত শুরু করতে হবে। আর এর জন্য নতুন নতুন পন্থাও বের করতে হবে। ইতোমধ্যেই আমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেটা হল স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ। তাহলে জনগণের প্রতিনিধিই জনগণের পাশে দাঁড়াবে। এরই সাথে আরও কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে। যুবসমাজকে সমাজ গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা, যুব প্রশিক্ষণ ঋণদান, আত্ম-কর্মসংস্থান-সেই সঙ্গে এক একটি পরিবারকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখানো। যেমন পূর্বে একটি পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, উৎপাদনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য যাতে সংসারের চাহিদা মিটিয়ে আবার বাজারে বিক্রির ব্যবস্থাও হয়- তাতে অর্থ উপার্জনের পথ খুলে যাবে। এর ফলে একটি পরিবার স্বাবলম্বী হতে পারে। এভাবে একটি পরিবারের সাথে সাথে গড়ে উঠবে একটি পাড়া,আর ঐ পাড়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এক -একটি গ্রাম। ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।এর প্রভাব পড়বে গ্রামে। ঢেউ লাগবে শহরে। মানুষ শহরমুখী হবে না ।

গ্রামের মানুষকে সহোযোগিতা করতে হবে। একটি পরিবার যাদের বসতবাড়ি আছে একটি উঠোন বা আঙিনা রয়েছে, পুকুর আছে অথবা ডোবা আছে পরিত্যক্ত। ঘরের পিছনে এক চিলতে বাগান অথবা গাছপালা, এরকম একটি পরিবার তাদের বাড়িটাকেই একটি আদর্শ খামারে পরিণত করতে পারে। ডোবা অথবা পুকুর সংস্কার করে মাছের চাষ করতে পারে। পুকুরে কলমিলতা, পানিফল বা যাকে বলে সিঙ্গারালতা লাগানো যাবে। পুকুরপাড়ে হাঁসের ঘর উঁচু মাচা করে দেয়া যায়,যাতে করে হাঁসের বিষ্ঠাপুকুরে ফেলা যায়। এই বিষ্ঠা মাছের উপযুক্ত খাদ্য হবে। পুকুরপাড়ে নারকেল ও সুপারিগাছ বারো হাত দূরে দূরে লাগানো হয়। সুপারিগাছ চার হাত দুরে করে জোড়া চারা লাগানো যায়। ফাঁকে ফাঁকে দুই-তিনটা নিমগাছ। নিমপাতা পুকুরের পানিকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। পুকুরপাড়ে ঝরাপাতার গাছ না লাগানোই ভালো। কারণ ঝরাপাতা পানিতে পড়ে পানি পচাবে। খেজুরগাছ, তালগাছ ও নারকেলগাছ লাগানো যায় যা পাড়ের মাটিকে ধরে রাখে। পরিবেশও উন্নত হয়। পুকুরের ঢালে লাউ, কুমড়া, করল্লা, ঝিঙে, ধুন্দল শশাসহ নানা ধরনের লতাগাছ পছন্দমতো লাগানো যায়। লাউয়ের ডগা খাওয়া যায়, আবার বাজারে বেচাও যাবে। মাচার নিচে হলুদ, আদা ও শঠির গাছ লাগানো যায়। বাড়ির আঙিনায় পেঁপে আতা কলাগাছসহ নানা ফলমূল লাগানো যায়। পেঁপে, কাঁচাকলা সবই খাওয়া যায় এবং তা অত্যন্ত পুষ্টিকর। শিম মোটাশিম, বরবটি, বিন ইত্যাদি লাগানো যায়। ঘরের ব্যবহারের জন্য মরিচের দুচারটা চারা লাগালে ঘরের খাবারের কাঁচা মরিচের জন্য বাজারে দৌড়াতে হবে না।নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে পাড়াপড়শিকেও সময়ে অসময়ে দেয়া যাবে। ঘরের পাশেই মুরগির ঘর করা যায়। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে যে মুরগির ঘর করা হয় তাতে অনেকগুলো মুরগি পালা যায়। সেই সঙ্গে কোয়েল, কবুতরও পালা যায়।

উঠোনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা পাতা, তরিতরকারির খোসা ইত্যাদি উঠোনের একেকোণে পুঁতে রাখলে খুব ভালো জৈব সার তৈরি হবে, যা তরকারির বাগানসহ অন্যান্য

কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। গাই গরু লালন-পালন, তার দুধ নিজেদের ব্যবহার ও বাজারে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা যায় ।

তবে এটা ঠিক যে, একটি পরিবার যে পরিমাণ উৎপাদন করবে তা নিয়ে বাজারে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া কে নিয়ে যাবে বাজারে তাও একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আবার সব পরিবারে উপযুক্ত ব্যক্তি নাও থাকতে পারে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের পথ হলো-গ্রামকে কেন্দ্র করে সঞ্চয় গড়ে তোলা। যে সমস্ত পরিবার নিজেরাই নিজেদের বাড়িকে একটি খামার হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন তারা সকলে মিলে একটি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায়ের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশদানে সহযোগিতা করা, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণে সুযোগ সৃষ্টি করা, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা। ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ রেখে কার্যপরিধি নির্ধারণ করা যায়। কাজে নামলেই সমস্যাগুলো স্পষ্ট হবে,আর তারই ভিত্তিতে কার্যক্রম নির্ধারণ করা যাবে। সমবায়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ।

এভাবেই একটি পরিবার নিজেই খামার গড়ে তুলতে পারে, আর এর ফলে গোটা গ্রামটাই স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আরও উন্নতমানের উৎপাদন করতে পারবে যা আমাদের অর্থনীতিতে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে। বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে যুবসমাজকে হতাশায় ভুগতে হবে না।

কৃষি, বনজ ফল, মৎস্য ও পশুপালন, নার্সারি, শাক-সবজি, হাঁস-মুরগি, পালন ইত্যাদি ছাড়াও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের মেয়েরা ঘরে সংসারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনমুখী অনেক ধরনের কাজ করে থাকেন। মহিলারা বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারেন। কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। সব থেকে বড় কথা হলো যে- কোনো কাজে লজ্জা থাকার কথা নয়। কোনো কাজই ছোট্ট নয়। নিজের কাজ নিজে করায় কোনো লজ্জা থাকা উচিত নয়। বাপ-দাদা যে কাজ করেছে সে কাজ করতে তো মোটেও লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। মনকে কখনো ছোট করা উচিত নয়। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। সব ধরনের কাজকেই গুরুত্ব দিতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সব কাজই অপরিহার্য। ভোকেশনাল ট্রেনিং ব্যাপকহারে দিতে হবে। যা যুবকদের কর্মমুখী করে গড়ে তুলবে। কর্মমুখী হলে মনে দুর্বলতা থাকবে না,তখন কাজ করতে আগ্রহী হবে, কাজের মর্যাদা বুঝতে পারবে। নিজের কাজ নিজে করার আনন্দই আলাদা।

আমাদের দেশের ছেলেরা বিদেশ যাচ্ছে। যারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শিক্ষার মান অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছে তাদের বিষয় আলাদা। কিন্তু চাকরি বা জীবন-জীবিকার জন্য কী কাজ করতে হবে সেসব চিন্তার সুযোগ যাদের নেই তাদের বিষয় ভেবে দেখতে হবে। কী ধরনের কাজ তাদের করতে হচ্ছে এবং করছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 'কথা' বলি। সৌদি আরবে হজের সময় দেখেছি আমাদের দেশের ছেলেরা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তা থেকে ময়লা কুড়াচ্ছে অর্থাৎ সুইপারের কাজ করছে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, কার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করেছি। আবার যারা প্রফেশনাল যেমন ডাক্তার, প্রকৌশলী ইত্যাদি তারা আবার এই শ্রেণিটাকে খুব নীচু চোখে দেখে। এমন এক অবস্থার মুখোমুখী হয়েছিলাম পবিত্র মদিনা শরীফে গিয়ে। ছেলেদের চোখে পানি দেখেছি। খুবই খারাপ লাগল। কাজের মান নিয়ে মাপামাপি আমি পছন্দ করি না। তাদের বললাম, সবাই পেটের ধান্দায় দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। কাজ ছোট হোক, বড় হোক, কাজ কাজই। কাজের মূল্য দেয়াই ভালো। বিদেশের মাটিতে বসে কে ছোট কাজ করে-সে বিচার না করাই ভালো। কোনোরকম অহমিকা থাকা ভালো না। মিলেমিশে কাজ করা ভালো। গরিব দেশের মানুষ আমরা, আমাদের এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। দারিদ্র আজ আমাদের এখানে টেনে এনেছে। সহানুভূতি নিয়ে সবার মিলেমিশে থাকা ভালো।

দারিদ্র্য দূর করার জন্য নিজের কাজ নিজে করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে। আর এ কাজে ব্লক সুপারভাইজার, স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার করতে পারে । এনজিওগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোও কর্মীদের কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া মৎস্য, পশু, কৃষিভূমি, বন, স্বাস্থ্যসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রচুর কর্মকর্তারা থানা পর্যায়ে রয়েছে। এই সকল কর্মকর্তারা যদি একটু মনোযোগসহকারে যার-যার বিভাগের কাজ আন্তরিকতার সাথে করে তাহলে তারাও এই গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতে পারে ।

আমি সরকার গঠন করার পর জেলা সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে উন্নয়ন বিষয়ে সভা করেছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, যে লোকবল আমাদের রয়েছে তাতে সকলে সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এত পিছিয়ে থাকতে পারে না।

আমাদের মাটি এত উর্বর-একটা বীজ ফেললেই অঙ্কুর হয়, গাছ হয়, ফল হয়। আমি অভাব যা দেখেছি, তা হলো উদ্যোগ ও আগ্রহ সৃষ্টির।

আর একটা বিষয় খুবই লক্ষণীয়-কবে থেকে এই মানসিকতা গড়ে উঠেছে আমি জানি না, অতীতে এমনটা ছিল না। ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর থেকে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে বহু ঘুরেছি, আর তখনই এই পরিবর্তনটা চোখে পড়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য উৎসাহিত না করে রিলিফ বা ভিক্ষা চাওয়া। হাত পাতা অথবা চাঁদাবাজি করা। খেটে না খেয়ে অতি সহজে উপার্জনের পথ খোঁজা। আর এটি যে কত গর্হিত কাজ, অসম্মানজনক কাজ? অনেকেই সহজ পন্থায় অর্থ উপার্জন করতে চায়, অর্থাৎ রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। কিন্তু কেন সকলের এ মানসিকতা? তবে এটি একটি ব্যাধি। সমাজে এ ব্যাধি ঢুকেছে ক্যান্সারের মতো যুবসমাজ খেটে খাবে না, চাঁদাবাজি করবে। আর সেই অসৎ পথের উপার্জিত অর্থ দ্বারা ঠাটবাট দেখাবে। অর্থের দম্ভ দেখালে বিবেক বলেও কিছুই কি নেই?

এত অর্থসম্পদ দিয়ে কি হবে। সবাইকে তো একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সাথে তো কেউ কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। ধনসম্পদ অর্থ বাড়ি গাড়ি দালান কোঠা সব ফেলে চলে যেতে হবে। তা হলে কেন অর্থসম্পদের পেছনে অন্ধের মতো ছোটো! সমাজের কোনো কোনো অংশে ঘুণ ধরেছে। এই ঘুণে ধরা সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে হবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে দেশের মানুষকে। শিক্ষা এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে যাতে করে মানুষ যেন কর্মবিমুখ না হয়। কোনো কাজকে যেন খাটো করে দেখা না হয়। সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে।

আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই-যে সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে। গ্রামকেই করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ।

(প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন" শীর্ষক গ্রন্থের অংশ বিশেষ)

বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু

মোঃ আমিনুল ইসলাম*

হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের মাটি, নদনদী, বৃক্ষ-তরুলতা, পশুপাখি ও মানুষ। নানারকমের চড়াই-উৎরাই আর রাজনৈতিক জোয়ারভাটার মধ্য দিয়ে সুদূর অতীত থেকে আজকের দিনে পদার্পণ করেছে বাংলাদেশ। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ্য, আজকের বাংলাদেশ অনেক নেতা, অনেক মনীষী, অনেক কবি-শিল্পী, অনেক সমাজসংস্কারক, অনেক বাউল, অনেক সাধক, অনেক পির আউলিয়া, এবং অসংখ্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সম্মিলিত মেধা ও শ্রমের ফসল। তবে সেই ফসলকে একটি স্বাধীন ও আপন উঠান উপহার দেওয়ার কৃতিত্ব মূলত একজন মানুষের। তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ স্বাধীনতা অর্জন-সংগ্রামের নেতৃত্বটি ছিল তাঁরই। এ কারণেই সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে তিনি স্বাধীনতার স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। অতীতে আমরা এক অর্থে কিছুটা স্বশাসিতই ছিলাম। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু সেটুকুও আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এক সময় নিজেদের ভুলে নিজেদের বিভেদে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা দখল করে নেয় বাংলা ভূখণ্ডসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ। অত্যাচার আর শোষণে পতিত হয় প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূমি। কৃষকসহ সাধারণ মানুষ পিষ্ট হতে থাকে অর্থনৈতিক অভাবের জাঁতাকলে। ব্রিটিশরা নিজেদের বরাবরই শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করে। তাই শোষণের পাশাপাশি তারা কিছু ভালো উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল। সেসবের একটি হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে এদেশে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা তাদের হাজারো অপকর্মের বিপরীতে একটি মহৎ প্রচেষ্টা বলে গণ্য হতে পারে। মূলত ব্রিটিশদের সৃষ্ট জমিদার মহাজনদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে সাধারণ কৃষকদের রক্ষা করতে তারা সমবায় ব্যাংকিং প্রথার প্রচলন করে যা কালক্রমে নানা পেশাজীবী মানুষের আর্থসামাজিক সুরক্ষার পথ হিসেবে বিস্তৃত হতে থাকে।

সমবায় এর আর্থসামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত

সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators.) সহজ কথায় সমবায় হচ্ছে মানুষের নিজেদের দ্বারা সংগঠিত, অর্থায়িত ও নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত সংগঠন যা স্বভাবে স্বাধীন, আচরণে গণতান্ত্রিক, দৃষ্টিতে দূরগামী, বৈশিষ্ট্যে সহমর্মী এবং ভাবনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বলা হয় মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। কিন্তু গরিব, পিছিয়ে থাকা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে একা একা নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দশজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। সেজন্যই বলা হয় 'দশের লাঠি একের বোঝা'। আর সমবায় সমিতিতে সকলেই একে অন্যের সহায়ক সহকর্মী বলে সেখানে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এমন নীতি নিয়ে সম্মিলিত হলে প্রতিজ্ঞায় ও প্রচেষ্টায় সফলতা অনিবার্য। সেজন্যই বিদ্রোহী কবি সাধারণ মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায়কে স্বাগত জানিয়ে রচনা করেছিলেন '**সমবায়-সংগীত**' যা নিম্নরূপ :

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি- রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপরে উপস্থাপিত সমবায়-সংগীতে সমবায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা চমৎকারভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। মূলত সমবায় হচ্ছে একতাই বল, গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস প্রভৃতি আপ্তবাক্যের অনুকূলে ও পথ ধরে মানুষের সমবেত শক্তির উদ্বোধন, উন্মোচন ও বিকাশ সাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। অসাধারণ ক্ষমতাধর বা প্রতিভাধর মানুষ একা একা অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পারেন না। সাধারণ মানুষ পারেন যখন তারা একতাবদ্ধ হন। তাদের জন্যই এ কথাটি প্রযোজ্য, 'United We stand, Divided We fall'. সমবায় হচ্ছে বিভাজিত নেতৃত্বহীন সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করে সামগ্রীক উন্নতি অর্জনের পথ।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন

প্রশ্ন উঠতে পারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শনের সঙ্গে সমবায়ের কী এমন সম্পর্ক রয়েছে যে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন' এমন একটি প্রতিপাদ্যকে আমরা বেছে নিয়েছি যা হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি চিরায়ত স্লোগান? যারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে খণ্ডিতভাবে দেখেন, তাদের পক্ষে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কিন্তু যারা তাঁকে সামগ্রিকভাবে দেখতে চান, দেখতে পান, তাদের পক্ষে বিষয়টি বুঝতে পারা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম!' সেই মুক্তি মানেই হচ্ছে আর্থসামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক অগ্রগতি। সেটা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের শোষণভিত্তিক বিলিয়নার হওয়ার বিপরীত অবস্থান। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, গ্রামবান্ধব স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। তাঁর জীবনদর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা; সেই গণমানুষ হলেন গ্রামের দিনমজুর, দরিদ্র কৃষক এবং শহরের গরিব সম্প্রদায়- তাদের জীবন ছিল শোষণে-বঞ্চনায়-দারিদ্র্যে-উপেক্ষায় অনেকটাই প্রাণহীন, অনেকখানি শুষ্ক মরুভূমি। আমাদের দেশের কবিরাই সেই অবস্থার যথাযথ ছবি এঁকে রেখেছেন :

'তবে সকলেই জানেন--সকলেরই বৃষ্টি চায়।
বৃষ্টি চায়--রাজবাড়ীর সোনালি আঁশের চাষি
বৃষ্টি চায়--মঙ্গাপীড়িত তিস্তাপাড়ের জেলে
বৃষ্টি চায়--প্রাইমারীর বেতনবিহীন মাস্টার
বৃষ্টি চায়--সুন্দরবনের বৃক্ষ-হরিণ-ময়ূর
বৃষ্টি চায়-- শুকিয়ে আসা ভাওয়াইয়া গানের গলা।'
(আঙুল ছুঁয়েছে আকাশ / আমিনুল ইসলাম)

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, দর্শন ছিল এই জনপদে সেই 'বৃষ্টি' এর ব্যবস্থা করা যার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতার এবং দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। তিনি সেটাই করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই মানুষগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন যা ছিল তাঁর সোনার বাংলার গড়ে তোলার মূল লক্ষ্য। তিনি জগৎ-নন্দিত সেই একই ভাষণে আরও বলেছিলেন,' আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের মুক্তি চাই।' এই মুক্তি কেবল পতাকার রং বদল আর জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন নয়; সেটা হচ্ছে মূলত সেই সময়ে শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত-শিক্ষাদীক্ষাহীন-সম্পদহীন মানুষের সামগ্রীক উন্নয়ন ও যাবতীয় দুঃখের অবসান নিশ্চিতকরণ।

প্রসঙ্গত সমবায় মানুষকে একত্রিত করে, সমবেত করে, একতাবদ্ধ করে, উদ্বুদ্ধ করে সমষ্টিগত লক্ষ্যার্জনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। বঙ্গবন্ধু সারাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তাদের সুপ্তশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন সমষ্টিগত লক্ষ্যার্জনের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। স্বভাবতই তা ছিল

জাতীয় পর্যায়ের কারণ তিনি ছিলেন আমাদের শ্রেষ্ঠতম একনম্বর জাতীয় নেতা।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং সমবায়

আর হ্যাঁ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আখ্যায়িত 'দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র সমবায়'-কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী থাকাকালেই সমবায়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর পড়ে তাঁর। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, '**ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।**' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু দুটি মহৎ কাজ করেন : সমবায়-সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির সম্মানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা এবং সমবায়কে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে গ্রহণ। তিনি সমবায়ের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "**আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।**"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমবায় ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা গরিব ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষকে আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও আর্থিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্যগণ। তাদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ ও জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ এবং সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সরকারের ব্যাপক কর্মমুখর ও লক্ষ্যাভিসারী কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সকল সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন, মহিলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৬,৪৯,৮০৩ জন। এ সকল সমবায় সমিতির মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা এবং অংশগত মূলধন ১,৭৭৩.১৪ কোটি টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৬,৩৫৪ কোটি টাকা। সমবায়ের মাধ্যমে ৯,৩৭,৪৩৬ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্য খাতের পাশাপাশি দুগ্ধ খাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন সমবায় সমিতি পরিবহন সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিআইডিএস এর ২০১১ সালের এক গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৯%। কিন্তু বাস্তবে সমবায় সেক্টরের অবদান কয়েকগুণ বেশি। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্রঋণদান ও সঞ্চয়, কুটিরশিল্প, চামড়াজাত শিল্প, মৃৎশিল্প, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি সেক্টরে আমাদের অর্থনীতিতে যে অবদান, সেই অবদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের সহযোগী ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। কিন্তু সেই অবদান যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়নি বলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায়ের অবদান আজও উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে সমবায়ের কার্যকর ভূমিকা

মানবসমাজ চলমান রয়েছে আমরা যাদের বলি 'সাধারণ জনগণ', মূলত তাদের কর্মপ্রবাহের শক্তিমন্ত্রে। যারা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য

উৎপাদন করেন, তারাই সচল রেখেছেন জীবনের গতি; তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজ-সংসার-সভ্যতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐকতান' নামক কবিতায় বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন :

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'।

সমবায় অধিদপ্তর মূলত এসব 'সাধারণ মানুষ'-দের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে সমবায়কে গ্রহণ করে আসছে। আমরা সেসবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করতে চাই।

১. কৃষকদের ঋণ সরবরাহ ও শোষণ হতে মুক্তির সূচনা

ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথা চালু করায় সাধারণ কৃষক-জেলে-তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে যা সেই সময়ে রচিত উপন্যাস-নাটক-কবিতা-গানে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে আজও। মেহনতি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত ' ওঠ রে চাষি জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল' গানে সেই অবস্থার ছবি তুলে ধরেছিলেন জীবন্তভাবে যার কয়েকটি লাইন এমন,

'ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায়-বা সেই গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই কো আমার হাত।'

কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে দাবি করে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ সবাই ক্ষুধায়-রোগে-শোকে-বঞ্চনায় ব্যাপকভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তাদের শাসন টিকিয়ে রাখাও কঠিনতর হয়ে যাবে ভেবে তারা কৃষক-জেলে-তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার একটি হচ্ছে সমবায় ব্যাংকিং। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় পদ্ধতি চালু করে। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯০৯ সালে সমবায় ব্যাংকিং চালু করা হয়। সেগুলোর নাম ছিল এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক। ১৯০৯ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে প্রায় শ'খানেক কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংক আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। এতে করে কৃষকগণ জমিদার-মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি অতিসুদের শোষণ থেকে নিজেদের কিছুটা হলেও রক্ষা করার বিকল্প পথ পায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হলে সমবায় ব্যাংকিং একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতাজনিত কারণে পরবর্তীতে সেই সোনালি সাফল্য অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ঋণ সরবরাহ অব্যাহত আছে। সমবায় ব্যাংকের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করে আসছে। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকগুলোর পাইওনিয়ারিং ভূমিকা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

২. তৃণমূলে গণতন্ত্রায়ন ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন

সাধারণ মানুষেরা এককভাবে চিরদিনই ক্ষমতাহীন এবং একতার অভাবে সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তিত্বরহিত। বিপরীতে জমিদার-মহাজন-ভূস্বামী-শিল্পপতি-রাজনীতিবিদ শ্রেণির মানুষ ক্ষমতাবান। সাধারণ মানুষ তখনই ক্ষমতার উৎস যখন তারা সচেতনভাবে একতাবদ্ধ। এ কাজটি মূলত গণতন্ত্রের। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল উপমহাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেটাও অচিরে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সমবায় মানুষকে তৃণমূল স্তরেই গণতন্ত্রের স্বাদ ও সাফল্য দিয়ে এসেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ সংবিধান বা উপ-আইন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা Mini Democracy। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন। এটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র (Quality Democracy)। এখানে ভোট কেনাবেচা নেই; মিডিয়াবাজি নেই; ভোট ডাকাতি নেই; সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নেই; পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি নেই; গালাগালি নেই; নির্বাচনোত্তর সহিংস প্রতিশোধপরায়ণতা নেই। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি বিখ্যাত গানে বৃহত্তর সমাজের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত/তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ্গো না কেন!' সমবায় হচ্ছে ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপরতার খোয়াড় থেকে বের করে আনার এবং ব্যক্তিত্বরহিত সমষ্টিকে প্রবল ব্যক্তিত্বে জাগিয়ে তোলার মোক্ষম মন্ত্র। সমবায় সমিতিই হচ্ছে 'জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতার মৌনতা' ভাঙার অব্যর্থ অস্ত্র। সমবায়ই সফলভাবে শেখাতে পারে : 'আমরা দুর্বল নই, আমরা পারি'। বাংলাদেশে সমবায়ের অতীত ও বর্তমান ভূমিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হলে সমবায়ের এই মানবশক্তির উদ্বোধন ও গ্রামবাংলার আনাচকানাচের গণতন্ত্রায়নের বিষয়টি সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস।

৩. কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা উপরে কৃষকদের উন্নয়নে সমবায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা তুলে ধরেছি। দারিদ্র্যপীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এক্ষেত্রে আখতার হামিদ খান এর দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির অবদানের কথা না বললেই নয়। এই মহান ব্যক্তির মহৎ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষিকাজ বলতে জমিতে ফসল ফলানো, মাছ চাষ, হাঁসমুরগি পালন, গবাদিপশুপালন, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন এসব কিছুর সমষ্টিকে বুঝায়। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে সমবায়। ব্রিটিশ আমলে

যখন কৃষকরা মহাজন-জমিদারদের চক্রবৃদ্ধি সুদসংবলিত ঋণের কবলে পড়ে জর্জরিত, তখন সমবায় ব্যাংকগুলোই কৃষকদের পাশে সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ বাংলাদেশ যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার সবখানি কৃতিত্ব কৃষি বিভাগের একার নয়; এর মূলে আছে সমবায়। কিন্তু সমবায়ের এই সহযোগী ভূমিকার মূল্যায়ন নেই, সমবায়ের অবদানের পরিমাপ নেই। ফলে স্বীকৃতিও নেই। এটা সমবায় বিভাগের একটা দুর্ভাগ্য। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে : কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি (৫২,৩২৬টি), কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (৭৫টি), কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি (৬৫টি), ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি (১০,০৬৩টি), উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন (৪৮৮টি) ও প্রাথমিক জমি বন্ধকি ব্যাংক (৬৮টি)। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭২,৪৬০ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং এটি একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আখচাষি সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭১, শেয়ার মূলধন ৭৩০.৫২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২৫৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১৯,২১৯.০৫ লক্ষ টাকা। সমিতিটি ২০১৯-'২০ অর্থবছরে ২১.৬২ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে সমবায় ব্যাংক ঋণ বিতরণ করেছে ৫১২৮.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় করেছে ৭,০৭৭.১৪ লক্ষ টাকা। সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ম্লান হয়ে পড়েছে। এনজিও তৎপরতা, নানা ধরনের বেসরকারি ব্যাংকের আধিক্য এবং ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও ভিশনারী নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে সরকার চেষ্টা করছে ব্যাংকটিকে তার সফল ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে। সমবায় বিভাগের কর্মী হিসেবে আমরা আশাবাদী হতে চাই।

৫. বাজারজাতকরণ সমবায়

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৭,৯৭৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৮১.৭৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৬৭.২৮ লক্ষ টাকা। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে অনেক দূর যেতে হবে। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাটি এখন প্রকট। বিশেষত উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুলো এ সমস্যায় ভুগছে সবচেয়ে বেশি। এটি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দেরও অবগতিতে আছে। সমবায় অধিদপ্তর এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে আসছে এবং ই-মার্কেটিং, উপজেলা স্তরে সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

৬. বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ তার কার্যক্রম

পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭টি, শেয়ার মূলধন ৪৬.৬১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৩৪ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু এ ধরনের সমবায় সমিতি যত বেশি সফল হবে, উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায় তত বেশি কার্যকর হবে। সমবায় অধিদপ্তরের সহকর্মীদের এ দিকটির প্রতি আরও বেশি গভীর ও দূরগামী দৃষ্টি দিতে হবে।

৭. শিল্প সমবায়

আমরা একসময় বস্ত্র শিল্পে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম। আমাদের তাঁতিদের তৈরি মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশি’ কবিতায় ঢাকাই শাড়ির কথা আছে : ‘ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া/পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।’ নজরুলের একটি বিখ্যাত প্রেমের গানের প্রথম দু’লাইন এরকম : ‘আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো চলো আমার বাড়ি/ওগো ভিন্ গেরামের নারী।’ বস্ত্রশিল্পে আমাদের স্বনির্ভরতার পিছনে ছিলেন তাঁতি সম্প্রদায় এবং তাদের সংগঠিত করেছিল তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো। দুঃখের বিষয় হলো নানবিধ কারণে বস্ত্র শিল্পের এখন দুর্দিন; দুর্দিন তাঁতি সমবায় সমিতিগুলোরও। দেশ ও জাতিকে অনেক দিয়ে তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো এখন হাড্ডিসার। এসব সমিতিকে আবার জাগিয়ে ও পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারলে দেশেরই লাভ হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতি সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩,২১০ টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৯,৬৩৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১,৭০০.৪৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ৪টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এ সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

ক. বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ

সমবায়ী তাঁতিদের জন্য বিদেশ থেকে রং, রাসায়নিক দ্রব্য, সুতা ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিসহ তাঁতিদের ঋণ প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সুতা বিতরণ করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

খ. বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিঃ

পাট এক সময় ছিল ‘সোনালি আঁশ’; তখন পাটকল সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো ছিল পাটকল শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। আজ সেসব কেবল সোনালি স্মৃতি। পাটকলগুলো এখন ভাঙা জমিদার বাড়ি; পাটকল শ্রমিকেরা নিঃস্ব প্রায় মানবপ্রজাতি। পাটচাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা (লিঃ) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ৩.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৬১.৭০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২.৩৬ লক্ষ টাকা ।

গ. দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ

পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/৮৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৫৬ লক্ষ টাকা ।

ঘ. সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতিদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরি করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা।

ঙ. মৃৎশিল্প উন্নয়নে সমবায়

আমাদের অর্থনীতিতে, আমাদের সভ্যতায়, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের সাহিত্যেসবখানেই মৃৎশিল্পের অবদান ও সোনালি ছাপ বিদ্যমান। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, ময়নামতির শালবণবিহার, উয়ারি বটেশ্বর, যেখানেই আমরা চোখ রাখি, সেখানেই মাটির টেরাকোটার অমর নিদর্শন আজও দেখতে পাই। এদেশ তো বলা যায় কামার-কুমার-কৃষকদের হাতে তৈরি। একসময় ঘরে ঘরে মাটির বাসনকোসন ব্যবহৃত হতো। এমনকি পূজোর মূর্তিগুলোও বৃহত্তর অর্থে মৃৎশিল্পের অন্তর্গত। মৃৎশিল্পীদের নিয়ে সেই বহুদিন আগে থেকেই একাধিক নামকরা সমবায় সমিতি রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে কুমিল্লার বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এ সমিতির সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়।

৮. মৎস্য সমবায়

মাছে-ভাতে বাঙালি প্রবাদটি বাঙালি জাতির সমবয়সি। মাছ হচ্ছে পৃথিবীর সেরা প্রাণীজ প্রোটিন যার কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। একসময় বাংলায় জেলে সম্প্রদায়ের অবস্থা খুবই মজবুত ছিল। তারাই আদি বাঙালি। বরেন্দ্র অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায় যারা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিলেন একসময় পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার আয়ু ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। সেই বিদ্রোহের নাম কৈবর্ত বিদ্রোহ। আজও বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ জেলায় দিবর দিঘি ও দিব্বকস্তম্ভ সেই বিজয়ের স্মৃতিসৌধ হয়ে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রভৃতি কালজয়ী উপণ্যাসে মৎস্যজীবীদের সুখ-দুঃখ ছবি হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ দেশের নদনদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ওয়াটার লর্ড-গণের শোষণ। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে মৎস্যজীবীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে সমবায়। সে কাজটি করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। সকল প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ১০,০৩০টি (প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯,৯৫৫টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৪টি, জাতীয় সমবায় সমিতি ১টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৯০,৫২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২,৪৯৭.৮৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫,৬৪১.১৭ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১,৬১৪.১৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে এর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহাল অধিগ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৭৭৩.৬০ লক্ষ টাকা।

৯. মহিলা সমবায় সমিতি

সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বাঁধানিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনম্মন্যতা প্রভৃতি নারীদের চার-দেয়ালে-বন্দি করে মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। নারীর তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার ছিল না। সম্পদের মালিকানা পুরোটাই ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধুই পুরুষের। পারিবারিক চৌহদ্দির/ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর। খেলাধুলা-গানসহ সব রকম চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, যৌতুক প্রথা, অকালমৃত্যু, স্বামীগৃহে চতুর্মুখী নির্যাতন নারীর নিত্যসঙ্গী ছিল। বাল্যবিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্বামীসহ পতিগৃহের সকলের সেবাকরণ, পুরুষের যৌনচাহিদা পূরণকরণ, সন্তান উৎপাদন, রান্না বান্না এসব কাজে আবদ্ধ থেকে চারদেয়ালের মধ্যে ঘরকন্না করাই ছিল নারীর অপরিহার্য নিয়তি। নারীও যে পুরুষের মতোই পুরোপুরি মানুষ, নারীও যে সকল কাজে পুরুষের সমান উপযুক্ত, নারীরও যে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাধীন পেশার অধিকার থাকা প্রয়োজন, নারীর যে সমান আত্মমর্যাদার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার, পুরুষজাতির মগজে ও ইচ্ছায় এসব ঠাঁই পেত না। সামাজিক-পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। মুসলমান নারীরও অবস্থা ছিল করুন। ভয়ংকর পর্দাপ্রথা নারীকে অবরোধবাসিনীর মানবেতর বন্দি জীবনে আটকে রেখেছিল। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বর্ণনা করেছেন : "নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল।...তাদের বাংলা শিক্ষাদান ছিল সমাজ ও ধর্ম বিরুদ্ধ। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ...গুরুতর রূপে অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হত না পর্দা নষ্ট হওয়ার ও দোজখে যাওয়ার ভয়ে।...খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু.... আর গরিব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম।"

বেগম রোকেয়া ছিলেন উপরে বর্ণিত অচলায়তন থেকে নারীর শৃঙ্খলমুক্তির অগ্রদূত। তিনি মেয়েদের ঘরে বন্দি না রেখে শিক্ষাদান করে কর্মস্থলে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ ও প্রণোদনা দান করেছিলেন। একইসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নারী জাগরণের কবি। তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন বহু কবিতা, গান ও প্রবন্ধ। নারীর ভেতরে সুপ্তশক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তার শুভ উদ্বোধন ঘটাতে আগুন-ঝরানো ভাষায় তিনি রচনা করে গেছেন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গান, 'নারী' শীর্ষক কবিতা। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নারী' কবিতায় বলেছেন,

> 'সেদিন সুদূর নয়--
> যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।'

আজ সারাদেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের নারীর জয়জয়কার। এক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তবে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা গ্রামের অশিক্ষিত মায়েদের মতোই যা অগোচরে রয়ে যায় সুধীমহলের, উন্নয়ন-গবেষকদের। সমবায় সমিতিগুলো অশিক্ষিত-আধাশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একজন গোলাপ বানু তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এমন কত গোলাপ বানু তৈরি হচ্ছে দেশের আনাচেকানাচে ! পিছনে কাজ করছে হাজারো সমবায় সমিতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের নারীর দুরবস্থাকে পুরুষের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ না দেখে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেহ নাহি দিবে অধিকার।' নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার এনে দিয়েছে শিক্ষা ও সমবায়। সমবায় সমিতিগুলো নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্তির। সারাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি এবং মোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা ২৬,৪৯,৮০৩

জন। মোট সমবায় সমিতির মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ২৭,৪৪৮টি। এসব মহিলা সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৪০৩ জন। শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২২,৯১৬.৪০ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ৮৯.১৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

নারীসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, অ্যাম্ব্রয়ডারি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০৯ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ০.১০ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৫৬ লক্ষ টাকা।

১০. পরিবহন সমবায়

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় টেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরি চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১,৩৪৬টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০৫,২২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৬৩.৯২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,১০৩.০৬ লক্ষ টাকা।

১১. গৃহায়ন সমবায়

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট একটি দেশ অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহত্তম (বিশ্বের অষ্টম) দেশ। ফলে আবাসনের বিষয়টি দিনদিন সমস্যা হয়ে উঠছে। অনেক মানুষ এতটুকু একখানি সুন্দর বাসার জন্য ছটফট করছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাসনা প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

> ‘বহুদিন মনে ছিল আশা
> ধরণীর এক কোণে
> রহিব আপন-মনে;
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা।’

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এই এতটুকু বাসা পাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার এবং হাউজিং কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি অনেক সমবায় সমিতি জমি কিনে আপন সদস্যদের মাঝে প্লট ও ফ্ল্যাট সরবরাহ করছে। এটি সমবায়ের একটি সময়োপযোগী ডাইমেনশন। ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষণীয়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ২২৮টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৫৩,৮৯৯ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৮৭.০৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,৮৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা। আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ঢাকা খ্রিস্টান মেট্রোপলিটন হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইতোমধ্যেই একটি উজ্জ্বল মডেলে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের জন্য মানসম্মত আবাসন ব্যবস্থা করে চলেছেন এবং সেসব সমিতির সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে। হয়তো একদিন গ্রাম পর্যায়েও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।

১২. দুগ্ধ সমবায়

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ‘আমার সন্তান’ কবিতায় অন্নপূর্ণা দেবীকে পার করার বিনিময়ে দেবীর কাছে একজন মা--ঈশ্বরী পাটুনীর প্রার্থনা ছিল, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’ দেবী তা মঞ্জুর করেছিলেন : তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান/দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।’ কিন্তু সেই বর বাংলার সব ঘরে পৌঁছায়নি। আমরা নজরুলের ‘দারিদ্র’ শীর্ষক কবিতাতেই সেই বঞ্চনার চিত্র দেখেছি :

> ‘পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
> দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!- মোর অধিকার
> আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র অসহ
> পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
> আমার দুয়ার ধরি!’

কিন্তু এখন আর সেই অসহ অবস্থা নেই। আজ বাংলার ঘরে ঘরে দুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে সমবায়। আর এ ধরনের সমবায়কে জাতীয় রূপ দেওয়ার এবং তার মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধশিল্পে স্বনির্ভর করার সমবায়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। এসব সমিতির মধ্যে আছে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। এই সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড নাম মিল্ক ভিটা। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৫১৭টি, ব্যক্তি সদস্য ১,১৭,৭৫৮ জন, শেয়ার মূলধন ৬৫৪.০৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৮৬৮.৩২ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৮৫.৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম ‘বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড’ নামে নামকরণ করা হয়। মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্ক ভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন, আইসক্রিম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে মিল্ক ভিটার সদস্য ৬৫টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪,৪১৪.৭৯ (চুয়াল্লিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ উনসত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৭.৩০ লক্ষ টাকা। সংরক্ষিত তহবিল ৪,৫৩২.৭৬ (পাঁচচল্লিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। এই সমিতি ২০১৯-’২০ অর্থবছরে প্রায় ৪.৩২ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। কয়েক বছর আগেও সমিতিটির বাৎসরিক লাভ ছিল ১৬/১৭ কোটি টাকা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এই সমিতির নিট লাভ কমে আসছে প্রতি বছর এবং এখন তা হতাশাজনক স্তরে নেমে যেতে বসেছে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে উত্তরণ অপরিহার্যভাবে আবশ্যক। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৭/১৮ কোটি প্রায়। দুধের

প্রয়োজনীয়তা ও বাজার দুই-ই অনেক বড়। লাখ লাখ মানুষ গরু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরও বেশি বেগবান, আরও বেশি বিস্তৃত, আরও বেশি লাভজনক করে তোলা ছাড়া পথ নেই। সমবায় অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে সকল প্রকার সাপোর্ট ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এটি অচিরেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।

১৩. বীমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ নামে দুটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে আরও অনেক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার অবকাশ আছে। বিশেষত প্রবাসী কর্মী এবং প্রবাস ফেরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

ক. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১, শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা ।

খ. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ

সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৯, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা ।

১৪. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং আরও কিছু এনজিও দাবি করে আসছে যে তারাই দেশে ক্ষুদ্রঋণ চালু করেছে। অথচ এ কাজটি ব্রিটিশ আমলেই শুরু করেছিল সমবায় ব্যাংকগুলো। আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে সমবায়। আর সেই ব্যাংকগুলোই শিখিয়েছে কীভাবে সঞ্চয়কে বাড়তি লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে হয়, কীভাবে শোধ করতে হয় ঋণের কিস্তি। আমাদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে নেপালের সমবায়ীরা সেদেশে চালু করেছে সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি। তাদের সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। কালব এর সদস্য সংখ্যা ৮১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ৩২১.৯০ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৮৬.৩৪ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৯.৭৭ কোটি টাকা ।

১৫. আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-'০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-'১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮,৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন/২০ পর্যন্ত ১,৪৭০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৯,৬৮২ জন, শেয়ার মূলধন ১০৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ষ টাকা।

১৬. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

একজন মনীষী মন্তব্য করেছেন যে, যদি পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে তা হবে পানি নিয়ে। দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি কারণে নদী-সমুদ্র-ভূগর্ভস্থ পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে ওঠার ফলে পানিসংকট প্রকটতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের জন্য আরেকটি কারণ হলো অভিন্ন নদীগুলোর উজানে পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে নদীগুলোর মরে যাওয়া বা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠা। এ অবস্থায় সুপরিকল্পিত ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশের পানি ও পানিসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর এক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

পানিসম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'১৯ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৩৩৪টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৪২,৮৩১ জন, শেয়ার মূলধন ৯০৩.২৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪,২৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৭,০৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা।

১৭. করোনা মহামারি মোকাবিলায় সমবায় সমিতির কার্যক্রম

এ বছরের প্রায় শুরু থেকে নতুন করোনা ভাইরাস (SARS- Cov2) বা কোভিড-১৯ এ যখন পুরো বিশ্ব টাল মাটাল তখন এদেশের সমবায় সমিতিগুলো শুধু নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই সমর্থ হয়নি, অধিকন্তু আর্তমানবতার সেবায় সফলভাবে এগিয়ে এসেছে। এ সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৭৭টি সমবায় সমিতি করোনা মহামারির প্রথম ৪ মাসে প্রায় ১,৯৬,৪৩৪ (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশ চৌত্রিশ) জন দুর্গত সদস্যদের মাঝে প্রায় ৯,৪৩,৬৯,২৮০ (নয়

কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশ আশি) টাকার ত্রাণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও ঢাকার বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তাদের সদস্যদের প্রায় ০৬ (ছয়) কোটি টাকা ঋণের সুদ মওকুফ করেছে। অধিকন্তু সমবায় সমিতিগুলো করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে। সমবায় সমিতিগুলো নিজ সদস্যদের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং প্রয়োজনে হাইব্রিড সরবরাহ করছে। তারা সদস্যদের করোনা মহামারি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করছে এবং আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করছে। সমবায়ের মূলনীতি 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে',- এটি এই করোনা মহামারিকালে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি আমরা।

- **সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ কিছু কার্যক্রম**

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্ক ফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয় ভাগ করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

- **বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে গৃহীত সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ**

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার পথ ধরে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও ভাগ্যোন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে যার সংক্ষিপ্তসার উপরে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা এই যে এগুলো সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ীদের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির করে তাদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক নয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসিয়ালি শেষ হওয়ার পর তা রিভলভিং ফান্ডের সহায়তায় চলতে থাকে এবং নতুন নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির হয়। এই বিশেষত্বের কারণে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধগণ তাদের নির্বাচনি এলাকায় সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। তেমন কয়েকটি প্রকল্পের কথা এখানে তুলে ধরা হলো :

ক. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১. উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১ ; প্রকল্প ব্যয় : ১৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।
২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; প্রকল্প ব্যয় : ২৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।
৩. আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন'; প্রকল্পের নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের ব্যয় : ৪০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

খ. ২০২০-'২১ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পসমূহ

১. 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প'; প্রকল্পের মেয়াদ: ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২২; প্রকল্প ব্যয় : ৪৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ।
২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৩; প্রকল্প ব্যয় : ৪৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।
৩. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ;প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৫৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।
৪. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ভেল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।
৫. সমবায়ের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলে বিকল্প জীবনযাত্রা সৃষ্টি প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৮০ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা।

- **বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো;
২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা;
৩. আন্তঃসমবায় সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্লাটফর্মে এনে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা;
৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ, হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ।

- **চলমান এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের শিক্ষা থেকে সমবায় সেক্টরে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ**

১. সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান দুগ্ধ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে সারাদেশে দুগ্ধ সেক্টরের উন্নয়নে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং চরাঞ্চলে এসব প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করা।পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মহিষ পালন প্রকল্প গ্রহণ;
২. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত গারো প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেশের অন্যান্য জেলায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায়ভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ;

৩. উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এর আওতায় প্রতিটি জেলায়/বিভাগে শো-রুম স্থাপন এবং মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপন;
৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা এবং গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহকরণ;
৫. সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সহ জাতীয় পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি/ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহ) ও মাঠ পর্যায়ের সমবায় অফিসসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য অবকাঠামোসহ আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ এবং
৭. আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা এবং সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য অধিদপ্তরসহ সমবায় সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; সেটি বাস্তবায়নে সমবায় হবে অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

আমরা সবাই জানি, জাতির পিতা ছিলেন পুঁজিবাদী শোষণের বিপক্ষে। আশার কথা, সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদের প্রবল আগ্রাসনের মুখে সমবায় এখন নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে সারাবিশ্বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৪০% এবং কানাডায় ৩৩% মানুষ সমবায়ের সাথে জড়িত। বিশ্বে ১০ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সমবায়। ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়ায় ৯০% কৃষক হচ্ছেন সমবায়ী : নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৯০% ডেইরি পণ্য সমবায়-ভিত্তিতে উৎপাদিত; জাপানে ভোক্তা সমবায় সমিতি (Consumers Cooperatives) সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ যার ৯০% মহিলা; ইউরোপে সমবায়ীর সংখ্যা ১৪ কোটি মানুষ; সেখানে ৩ লাখ সমবায় সমিতি ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে;

ভারতে White Revolution সৃষ্টিকারী Gujarat Co- operative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) হচ্ছে সেদেশের বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ অর্গানাইজেশন যার পণ্যের ব্রাণ্ড নাম ‘আমূল’ এবং যা ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশেও সমবায় দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জুলাই ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১১ বছরে ১,৩৭,৮৫০টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। উন্নয়নের পন্থা হিসেবে এটি সমবায়ের উজ্জ্বল ভূমিকার স্বাক্ষর বহন করে।

জাতীয় কবি এবং জাতির পিতা দেশকে ভালোবাসা এবং সমবায় উন্নয়ন পদ্ধতি, উভয় ক্ষেত্রে সমরূপ ভাবনার মানুষ ছিলেন। একজন ছিলেন রাজনৈতিক ভাবনার কবি; আরেক জন ছিলেন রাজনীতির কবি। একজন ছিলেন স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনকারী কবি; আরেকজন ছিলেন স্বাধীনতা নামক কবিতাটি রচনার কবি। তাঁদের দুজনকে একসূত্রে গ্রোথিত করে রচিত আমার একটি কবিতা দিয়ে আলোচনার উপসংহার টানতে চাই। কবিতাটির নাম ‘**কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার**’ :

‘(দোয়েল চত্বরে সুবেহ সাদেকের হাওয়া মেখে শাহবাগমুখী হেঁটে যেতে থাকা পথিককে মাঝপথে ইশারায় ডাক দিয়ে কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার)

ভোরের হাওয়া অনেক খেয়েছো-এবার একটা অনুরোধ শুনে যাও!
আমি তো আপনাকে ছাড়া কাউকে কখনো কুর্নিশ করিনি;
কিন্তু এই নাও আমার মরণোত্তর সালাম--এটি পৌঁছে দিও
সবুজের স্নেহমাখা টুঙ্গিপাড়ায়- যেখানে ঘুমিয়ে আছে
আমার স্বপ্নের রূপকার শেখ মুজিব;
সে-ই আমার হৃদয়ের ডাকটা ষোলআনা শুনতে পেয়েছিল;
তোমরা তাকে ভালোমতো বোঝোনি--যেমন বোঝোনি আমাকে।
বাংলা বাঙালির হয়েছে দেখে খুউব খুশি হয়েছি-
যদিও বিভাজনে আমার সায় ছিল না;

কোলকাতায় ওরা কেমন আছে জানি না। তবে লালসবুজের এই
অর্জনকে ছোট করে দেখি না আমি। হে পথিক! ঘুমোত্তর হাওয়ায়
গা ভাসিয়ে চলেছো তুমি পা দিয়ে স্বাধীন সড়কের বুকে। আমি ঘুমুতে
পারিনি আজো; হানাহানির শব্দে বন্ধচোখেও আমার ঘুম আসে না;
আমি তো চেয়েছি মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যাক
বিধাতার আরশের ছাদ;
কিন্তু তোমরা এখনো ডিঙাতে পারোনি--
বিভেদ-বঞ্চনার বামন পাহাড়।
হে বাঙালি! বাংলা তো তোমাদের হলো;
এবার গড়ে তোলো-- আমি যাকে বলেছি
‘ধূলায় তাজমহল’।
তাহলেই ঝটপট ঘুমিয়ে পড়বো আমি।

মানুষ তো কত কিছুই ভুলে যায়; স্মরণের ধূসর পথ বেয়ে সেদিন
যদি ফুল দিতে আর নাও আসো, আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।’

জাতীয় কবির ‘ধূলায় তাজমহল’ আর জাতির পিতার সোনার বাংলা হচ্ছে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত, নারী পুরুষের সম-অধিকারে সমুন্নত আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গ্রাম বাংলা। জাতীয় কবি, বেগম রোকেয়া, জাতির পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও সম্পূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীগণ। সেদিন সুদূর নয় যেদিন বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের কাতারে শামিল হবে। বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠবে এক একটি ক্ষুদ্র সোনার বাংলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ সমবায় ও সমবায় অধিদপ্তর। বিজয় আমাদের নিশ্চিত।

* **মোঃ আমিনুল ইসলাম :** নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
(লেখক নাম : আমিনুল ইসলাম)

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং টেকসই উন্নয়ন

ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধু আজীবন সাধারণের কল্যাণ ভাবনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। একেবারে ছেলেবেলা থেকে তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখের সমব্যথী ছিলেন। তাই তাদের ভাগ্যোন্নয়নে চিরকাল নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি খুবই বাস্তববাদী ছিলেন। কৃষক, শ্রমিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। সংবিধানের ১৪ নং ধারায় স্পষ্ট করেই এ কথাটি বলা আছে। তবে একই সঙ্গে ব্যক্তিখাত ও সমবায় খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ১৩ নং ধারাতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিখাতের মালিকানায় থাকবে উৎপাদনের উপায়সমূহ। সমবায় ব্যবস্থার প্রতি বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা সংবিধান রচনার আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত 'সমবায় সম্মেলন'-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন, "সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একই ভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের

যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।

কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা।

আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনোমতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি সার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লির কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার—আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।" (সূত্র : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এফএফডিএফ) ওয়েব সাইট)]

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গড়ে তুলে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের ১৩ কোটি ১২ লাখ টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। দেশের সবাই যেন সহজলভ্যে দুগ্ধসেবা পায় তাই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)। মিল্ক ভিটার অধীনে বাংলাদেশের তরল দুধের ৭০ শতাংশ বাজার দখলে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে কোম্পানিটির কারখানা রয়েছে। (সূত্র- উইকিপিডিয়া)

তৎকালীন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধুর সমবায়-প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারেনি। সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠার আগে বঙ্গবন্ধু ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন এ দেশের জমিগুলো বেশিরভাগই জোতদারদের হাতে। অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে, কিছু জমি পতিত। আর কিছু জমি দেশভাগের পর থেকেই 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য। ভূমির সুসম বণ্টনের জন্য ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে ভূমিস্বত্ব আদেশ জারি করেন। তাতে পরিবারপিছু সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। এর অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু, সরকারের নিজ দলের ভিতরেই প্রতিরোধের কারণে এই আদেশ কার্যকর সম্ভবপর হয়নি। কারণ, '১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধনী কৃষক, তাদের মোট জমির পরিমাণ ১০০ বিঘার বেশি ছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর ভূমিসংস্কারের বিরোধিতা করেন। বিবাহিত পুত্রদের আলাদা বাড়িঘর গণ্য না করাকে তারা অযৌক্তিক মনে করেন।' (বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ২৬)

ফলে এই আইনের মাধ্যমে খুব সামান্য জমি উদ্ধার করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়। নজরুল ইসলাম মনে করেন, ভূমিসংস্কারের বদলে সমবায়ভিত্তিক যৌথ চাষের যে প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু করেন, তা রাজনৈতিকভাবে আপসমূলক হলেও এটি ছিল অধিক বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির পরিমাণ এত কম যে বাধ্যতামূলক সিলিং আরোপ করে যে উদ্বৃত্ত জমি মিলবে, সব ভূমিহীনের মধ্যে তা বণ্টন অসম্ভব। তা ছাড়া বণ্টিত জমির আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জমির নতুন মালিক প্রতিবেশী জোতদারের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। এই অবস্থায় একটি বাস্তবসম্মত সমাধান হতে পারে জমির যৌথভিত্তিক চাষাবাদ।

অর্থাত্, ভূমিসংস্কার বঙ্গবন্ধু যখন করতে পারলেন না তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই যেতে হলো সমবায় আন্দোলনে। আর সমবায় আন্দোলন বললেই হয়ে যায় না। এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তাই ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ তিনি দিলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। দ্বিতীয় বিপ্লব মূলত বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ গঠন করার প্রচেষ্টা।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেন। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই—যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান—এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ—এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ—যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে।

এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে।” (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭)

পুরো ভাষণটিতেই বঙ্গবন্ধু সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ভাষণটি সম্পূর্ণ পাঠ না করলে কিংবা না শুনলে বুঝা যাবে না দেশজাতি নিয়ে তিনি কতবড় স্বপ্ন দেখতেন। শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন, কাজে নেমে পড়েছিলেন। শিক্ষিত তরুণদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন, “আমার যুবক ভাইরা, আমি যে- কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই। ” (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৯)

উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, “গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে- কৃষক, সমবায় ও সরকার।” এই গ্রামীণ সমবায়কে তিনি নতুন গ্রাম সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁদের হাতেই উন্নয়ন বাজেটের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হবে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামও থাকবে তাদের হাতে। তিনি বলেছিলেন, “এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে।”

এই সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি জানতেন গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো মধ্যস্বত্বভোগী ‘টাউট’দের কাছে কতভাবেই না শোষিত হচ্ছিলেন। এটা সম্ভব হচ্ছিল সাধারণ মানুষের ভিতরে ঐক্যের অভাবের কারণে। মানুষ একা একা থাকলেই এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী তাদের পেয়ে বসে। যেহেতু গ্রাম-বাংলাকে তিনি নিবিড়ভাবে দেখেছেন তাই এই সত্যের সন্ধান তিনি যথার্থই পেয়েছিলেন। ঠিক যেমনটি পেয়েছিলেন আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব বাংলার জমিদারি পরিচালনা করতে এসে তিনি দুঃখী কৃষককুলকে খুবই কাছ থেকে দেখেছিলেন। আর তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন “মানুষ খাটো হয় কোথায়? যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরের মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র।” (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩)

...“আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি।” (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪)

...“মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোল-আনা পেয়ে থাকে।”(সমবায়-২ রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭)

...অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, “আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক’রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্যে লাভ করা। একেই বলে সময়বায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক-ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে-পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।” (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮)

মনে হয় বিশ্বকবির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন আমাদের জাতির জনক রাজনীতির অমর কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, আর তারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি পুরো গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে হাত দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের জন্য যে-ধরনের প্রণোদনা দরকার তাও ছিল। কিন্তু সবাই মিলে যৌথ খামারের অংশীদার করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। হয়তো ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থায় আরো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটত। কিন্তু সেই নিরীক্ষার তিনি ‘সুযোগ’ই পেলেন না। ঘাতকরা মাঝ পথেই তাঁর স্বপ্নের সেই অভিযাত্রা হঠাৎ স্তিমিত করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমবায়ের যে সম্মিলনের চেতনা আজও তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। বিশেষ করে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে এই ব্যবস্থা এখনো কার্যকর হবার দাবি রাখে।

‘কাউকে পিছনে ফেলে এগোনো যাবে না’—চলমান টেকসই উন্নয়ন ভাবনার এই মূলনীতির সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার সরাসরি সংগতি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশ এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মহা সড়কে। টেকসই উন্নয়নের এই অভিযাত্রায় নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার মূল অনুভব সর্বদায় আমাদের সচেতন ও সক্রিয় রাখবে।

ড. আতিউর রহমান : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সমবায়ই শক্তি : গড়তে হবে গণমুখী সমবায় আন্দোলন

অধ্যাপক আবুল বারকাত

মানবজীবনে সম্মিলিত ইতিবাচক প্রয়াস কখনো ব্যর্থ হয় না। সম্মিলিত প্রয়াসে মানুষের সৃজনশীল শক্তির উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব-যেখানে গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিচিশ্ত হতে পারে । আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ-দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। বঙ্গবন্ধুর এ-দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র জনগনই সৃষ্টি করে"আথাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অথনৈতিক, সমাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন, যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারবাহিকাতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগন" [বাংলাদেশ সাংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]।

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানবিক সংগ্রামী এ-দর্শনের প্রতিফলনই হলো তার স্বপ্ন : "সোনার বাংলার স্বপ্ন", "দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো স্বপ্ন ", "শোষণ-বঞ্চনা- দুদর্শামুক্ত বাংলাদেশ-এর স্বপ্ন"। এ-স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়োছিলো বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেখানে স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশে জনগনের জন্য কমপক্ষে ২টি বিষয় নিশ্চিত করা : (১) মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর, এবং (২) অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ।

বাংলাদেশ সমবায় : ফিরে দেখা

এদেশের সমবায়ে ইতিহাস আসলে ৫০০ বছরের হলও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় গঠনের ১০০ বছরের বেশি। একটি পদ্ধতি এ-সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্য দিয়েই এর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রমাণ হয়। যদিও সরকারী ও ব্যাক্তিখ্যাতের তুলনায় সমবায় খাতের ব্যবহার ও বিকাশ আমাদের দেশে এখনো সীমিত এবং ক্ষেত্রে বিশেষে অপরিকল্পিত তথাপি এ- দীর্ঘযাত্রায় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত

বেশ কিছু কর্মসূচি মাঠ পযায়ে তুলনামুলক সফলভাবে বাস্তবায়নে অবিজ্ঞতা রয়েছে অধিদপ্তরের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সমবায়ী উদ্যোগকে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। ১৯৭২ সনে আমাদের দেমে দুই ধরনের সমবায়ী নীতি চালু হয় : (১) সমবায় বিভাগের অধীনে চিরায়ত সমবায়,(২) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিবি) অধীনে দ্বিস্তর বিশিষ্ট নতুন সমবায়।

দারিদ্র পীড়িত ও নিরক্ষর কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগটিত করে উন্নত বীজ,সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যাবহারে উদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে এ দেশে সমবায়ের অবদান অনস্বীকায। এ লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গয়ে তোলা হয় এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে এবং প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করে কৃকষদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮০'দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিল্পব সূচিত হয়। অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক ব্যাবস্থপনায় গাভি পালন, গাভির জাত উন্নয়ন এবং সংগৃহিত দুধ প্রক্রিয়াকরণের মধ্যামে শহরাঞ্চলের অনভ্যস্ত ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ও মিল্ক ভিটার সৃষ্টি সমবায় অধিদপ্তরের একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৩৬ এবং ফেডারশনের সংখ্যা একটি যা মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত। মিল্ক ভিটার মাধ্যামে বাৎসরিক দুধ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৭.৫ কোটি লিটার এবং বাৎসরিক লেনদেন প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং মিল্ক ভিটার কমরত কর্মকর্তা /কর্মচারী সংখ্যা প্রায় এক হাজার এক শত। বতর্মানে বাজারজাতকৃত মোট পাস্তরিত তরল দুধ প্রায় ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে মিল্ক ভিটা।

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাভাবিক উন্নয়ন সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনে-কুশলতা বৃদ্ধিতে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকায। তাছাড়া মানব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সমবায় ভূমিকায় অনস্বীকায। তাছাড়া মানব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সমবায়ের অবদান যথেষ্ট। দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সমবায়ের মতো আনুষ্ঠিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য এক বিরাট ও মহৎ অভিজ্ঞতা। প্রশিক্ষণের মাধ্যামে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা,নির্বাচন ও সভা অনুষ্ঠান, হিসাব রক্ষন অডিটসহ আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সমবায়ের সদস্যদের যে নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে তা ঐ সকল সদস্যদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তোলে।

সমবায়ে সুশাসন ও দুর্বলতা

সুশাসন-সমবায় সফল্যের পূর্বশর্ত। সুশাসিত সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট হতে হবে নিম্নরূপ :

ক. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত

খ. উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিচালিত কার্যক্রম তুলনামূলক সুবিধারবিবেচনাপ্রসুত এবং নৈতিকভাবে সৎ ও ব্যবসায়িকভাবে দক্ষ ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত। ফলে ঐ সমিতি সদস্যদের জন্য আর্থসামাজিক সুবিধা সৃষ্টি ও বণ্টনে সক্ষম; এর সদস্যরা প্রশিক্ষিত এবং সমিতির উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও নিজেরদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন;

গ. সমিতি পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমবায় আইন ও বিধি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমটি অবহিত এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃদ্বন্দ্ব মোকাবেলায় বিশেষভাবে পারদশী;

ঘ. স্থানীয়ভাবে সোচ্চার নাগরিক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারা। তত্ত্বীয়ভাবে সমবায় পদ্ধতি এবং সমবায় সংগঠনের কার্যক্রম সুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমবায়ের ৭টি নীতিমালার সবাই সুশাসন বান্ধব। এগুলো হচেছ স্বতস্ফুর্ত ও অবাধ সদস্যপদ; সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ; সদস্যদের আর্থিক অংশগ্রহণ; স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা; প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রসার; সমবায় সহযোগিতা; এবং সামাজিক অঙ্গীকার।

সমবায়ের মধ্যে সুশাসন অন্তর্নিহিত থাকলেও সুদীর্ঘ ১০০ বছরের বেশী সময়কাল যাবত এদেশে সমবায়ের যে চর্চা হয়ে আসছে তাতে সুশাসন কতটুকু বিদ্যমান তা নিরুপণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সংকলিত সর্বশেষ (জুন ২০১০) ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৬৯,৩০৫ টি। এর মধ্যে ২টি জাতীয়/ জাতীয় পর্যায়ের, ১০৯৯ টি কেন্দ্রীয় এবং ১,৬৮,১৮৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায়ের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ।

সমবায় সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি তাদের কার্যক্রমে প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু পাশাপাশি অনেক সমবায় সমিতি বিশেষ করে পল্লী এলাকার বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট কৃষক এবং বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলো আকারে খুবই ছোট এবং আর্থিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। সমবায় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় অসমবায়ীদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্যণীয়। উৎপাদন পর্যায়ে অনেক সমবায় সমিতি সংগঠিত থাকলেও বাজারকরণে একমাত্র দুগ্ধ খাত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সমায়ের তেমন উপস্থিতি চোখে পড়েনা। ফলে উৎপাদনকারী সমবায়ী ও চূড়ান্ত ভোক্তা শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে ও মধ্যসত্ত্বাভোগীদের দৌরাত্ম ঠেকাতে সমবায়ের ব্যর্থতা লক্ষণীয়। এছাড়াও আছে- দুর্বল, অদক্ষ ও অসৎ ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের সম্পৃক্তকরণে ব্যর্থতা। সমবায় আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং অনুশীলন দুর্বল বা ক্ষেত্র বিশেষে অনুপস্থিত । সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিক বিবেচনায় সমবায় সমিতির বর্তমান সংখ্যা অতিরিক্ত বলে প্রতিয়মান। বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা অকার্যকর এবরং সম্ভবনাহীন।সমবায়ের নীতি ও মূল্যবোধের অনুশীলণ অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত ফলে অন্তর্কলহ এবং বিবাধ বিসম্বাদ লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের কারণে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও ঋণ মুক্ত শহরে সমবায়ের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । এ সকল সমিতিই বর্তমানে সফল যদিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই আইনী সমর্থনের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর "গণমুখী সমবায়" চিন্তা ও "রুপকল্প ২০২১"

অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়কে গণমুখী করে এর অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করা। আর সে কারণেই মালিকানার নীতিবিষয়ে সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হলো গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবে প্রথমত রাষ্ট্রিয় মালিকানা, দ্বিতীয়ত সমবায়ী মালিকানা, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত মালিকানা। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তা সমৃদ্ধ তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সনের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। গুরুত্বের কারণে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি;

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পারে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে"- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় অন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ,

গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন-কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক -সমিতি যেন সত্যিকারে জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবারএইসমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।"

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন কেন্দ্রিক মানকি উন্নয়ন দর্শনের ধারাবাহিকতায় যুক্তি যুক্তভাবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে নিয়েছেন বিভিন্ন কর্মসুচী ও উন্নয়ন প্রকল্প - যেমন আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় ছিন্নমূল মানুষেদেরকে সংগঠিত করে গৃহ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা। বাস্তবায়নাধীন "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি" এর আওতায় প্রতিটি গ্রামকে একটি সমবায়ের আওতায় এন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। প্রতিটি বাড়ীকে একটি খামার" প্রকল্প। এর আওতায় সুবিধাভোগীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপশি গ্রামের অব্যবহৃত ও পতিত সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আদিবাসী গারো সম্প্রদায়কে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। "গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" প্রকল্প। বাংলাদেশের আদিবাসী মানুষদের জন্য প্রথমবারের মত গৃহীত এ প্রকল্প ইতোমধ্যে সর্বমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে যা প্রকারান্তরে সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন, সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকল্পে সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য অন্তর্ভূক্ত আছে আরও ৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প।

লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এসব সমবায় সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত গণমুখী সমবায় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের পথে সাধারণতঃ যেসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তার মধ্যে সমবায় প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত জাতীয় নীতিমালা ও সমবায়- বান্ধব আইনের অনুপস্থিতি, সমবায় অধিদপ্তরের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলসহ লজিষ্টিক সাপোর্টের অভাব, অসমবায়ীদের অনুপ্রবেশ ও অযাচিত হস্তক্ষেপ, সমবায় সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশ সমবায়ই শক্তি হিসেবে হয়ে উঠার নেপথ্যে অন্যান্য বাধাগুলো হলো- উপযুক্ত বাস্তবমুখী শিক্ষার অভাব, সততার অভাব, দুর্নীতির প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ঋণ আদায়ের অব্যবস্থা, জনসমর্থন ও মূলধনের অভাব, অর্থনৈতিক সংকট এবং যথার্থ সমবায়ী মনমানসিকতার অভাব।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থবহ ভূমিকা পালনের জন্যতাই এসব সমস্যা সমাধানে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রথমেই বলা উচিত জাতীয় সমবায় নীতিমালার কথা। সমবায় কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়াতে সমবায়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত একটি জাতীয় সমবায় নীতিমালা থাকা জরুরী। বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে সময়োপযোগী ও সমবায় বান্ধব করতে হবে। সমবায় বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে সময়োপযোগী ও সমবায় বান্ধব করতে হবে। সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোন মহল যাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও চরিত্র নষ্ট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। উড়ে এসে জুড়ে বসা, সুযোগসন্ধানী, দুর্নীতিবাজ ও মামলাবাজদের বাহিস্কার করেগণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রকৃত সমবায়ীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে সমবায়ীদের জন্য সময়োপযোগী, পেশাভিত্তিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বর্তমান অসংখ্য সমবায় সমিতি অকার্যকর ও সম্ভবনাহীন অবস্থায় বিরাজ করছে। এগুলোর পেছনে প্রতি বছর অহেতুক জনবল ও সময় ব্যয় হচ্ছে। কাজেই এগুলোকে দ্রুত গুটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে। বিদ্যমান প্রায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার সমিতির মধ্যে প্রায় ৯৩,০০০ সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সংগঠিত বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট এসব সমিতির দায়িত্ব বিআরডিবির কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। সমবায় কৃষিঋণ কার্যক্রম পুনঃ প্রচলন এবং ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়নের জন্য বিদ্যমান ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতির সংস্কার ও নতুন নীতিমালা প্রনয়ণ করতে হবে। তাছাড়া সমবায় খাতের অর্থায়নের জন্য একটি পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন জরুরী। সে লক্ষ্যে বিদ্যমান বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের পুনগঠনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত ব্যাংককে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

এসব দায়িত্ব সঠিক ও দ্রুততার সাথে পালনের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরকে গতিশীল এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সত্যিকার দক্ষ ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে গতিশীলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস ও জনবল বৃদ্ধিসহ সমবায় কর্মকর্তাদের পদ উন্নীত করে অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। সমবায় কর্মকর্তাদের পেশাগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত উৎকর্ষ আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

সংকটের আর্বতে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করে আগামী ২০২০-২১ সালের মাহেন্দ্রক্ষণে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে যোষণা করা হয়েছে। "রূপকল্প ২০২১। সুনির্দিষ্ট ২২ টি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি তার অর্থনৈতি হবে প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিঞ্চু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার নারীরা ভোগ করবে সমান অধিকার , থাকবে আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ। এক্ষেত্রে সফলতা পরিমাপের নির্দেশক সমূহ হলো অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি উচ্চতর ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুততার সাথে দারিদ্র হ্রাস, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্রের অনুশীলন ইত্যাদি। এসবের সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সকল অর্থনৈতিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস। এসব শক্তির অন্যতম হল গণমুখী সমবায় আন্দোলন।"

বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত 'গণমুখী সমবায় আন্দোলন' বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত "রূপকল্প ২০২১" এর ২২ টি সময়- নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কতটুকু অবদান রাখতে পারে। বিষয়টি বুঝতে আমরা দেশের ২৬ টি জেলার সমবায় সমিতির ৫৫ জন জ্ঞান- সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞ সদস্যদেরকাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য -উপাত্ত ধ্যান -ধারনা সংগ্রহ করেছি। আমারা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রূপকল্প ২০২১" এ প্রদেয় ২২ টি সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটি (আলাদা-আলাদাভাবে) অর্জনে সমবায় -সমবায়ীদের ভূমিকা কি হতে পারে? অভিজ্ঞ-

জ্ঞানসমৃদ্ধ সমবায়ীরা প্রায় ১,২০০ সুপারিশ দিয়েছেন, ধারনা-মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব সুপারিশ ধারণা থেকে সমবায় সংশ্লিষ্ট নীতি নির্দ্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা অনেক পথনির্দেশ পেতে পারেন। তবে সমবায় নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের কাজ হবে একদিকে যেমন তৃণমূল- উত্থিত সুপারিশসমূহ আত্মস্থ করা অন্যদিকে সুপারিশসমূহের শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং সেই সাথে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে স্বল্প মধ্য দীর্ঘমেয়াদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উপসংহার

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নির্দেশিত (১৯৭২ সনে) "গণমুখী সমবায় আন্দোলন" এর বিকল্প নেই। এ - আন্দোলন সফল করতে একদিকে যেমন দরকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নসহ বর্তমান সমবায় আন্দোলন জোরদার ও বহুমুখী সম্প্রসারণ তেমনি প্রয়োজন সমবায় চেতনা ভিত্তিক একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত মালিকানার নীতি সংক্রান্ত 'সমবায় মালিকানা-ও (সাংবিধান অনুচ্ছেদ১৩) বিষয়টি আমাদের" দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন : এর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। সুতরাং বর্তমানে প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন জাতীয় উন্নয়ন নীতি কৌশল ষষ্ঠ পুঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সকল আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে 'গণমুখী সমবায় আন্দোলন' বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সবারই মনে রাখা জরুরী, ১ কোটি মানুষের আমাদের দেশে কমপক্ষে ১০ কোটি মানুষই বিভিন্ন মাপকাঠিতে দারিদ্র -বঞ্চিত - দুর্দশাগ্রস্ত । অতএব এ দেশের উন্নয়ন মানে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধ নয়, উন্নয়ন মানে হতে হবে বৈষম্য হ্রাস। উন্নয়নকে দেখতে হবে আন্দোলন হিসেবে । যে আন্দোলনে অন্যতম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে পরিকল্পিত " গণমুখী সমবায় আন্দোলন"।

(বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে মূল প্রতিপাদ্য "সমবায়ই শক্তি : গড়তে হবে গনমুখী সমবায় আন্দোলন" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ)

গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে সমবায় আন্দোলন

মো. মফিজুল ইসলাম

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপনের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত জনগোষ্ঠী কিছু নাগরিক সুবিধা ভোগ করে, যা গ্রামের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিদ্যুৎ, পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার জন্য গ্যাস, ক্যাবল টিভির সম্প্রচার, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেবার বেশির ভাগ থেকেই গ্রামের মানুষ বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ সবুজ প্রকৃতি, বিশুদ্ধ বাতাস, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, তাজা শাকসবজি এবং দূষণমুক্ত পরিবেশের সুবিধা পেলেও শহরে বসবাসকারী নাগরিকগোষ্ঠী তা থেকে বঞ্চিত হয়। জীবন যাপনের এই ব্যতিক্রমধর্মী বৈচিত্র্য থাকলেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের সঙ্গী হচ্ছে দারিদ্র্য। গ্রামের মানুষ নানামুখী দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে। পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত দারিদ্র্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য, মানবাধিকার ও আয় বৈষম্যজনিত দারিদ্র্যসহ নানামুখী প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় গ্রামের মানুষকে।

নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নগর ও গ্রামীণ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমবায় নীতি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'লোভের উত্তেজনা, শক্তি উপাসনা, যে অবস্থায় সমাজে কোন কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সাধনার দিকে মন দিতে পারে না; সে প্রবল হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায় না। এই রকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায় এবং তার পরিবর্তে কোন রকম জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন একটা ভাগ হয় যাতে এক দিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন যে, "নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র,

গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনোই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর-একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে উঠে। সেখানে মুখ্যত মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। দেখতে দেখতে গত ৫০ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে ‘ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ’; গ্রামগুলি শহরকে চারিদিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।”

বাংলাদেশের চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি অন্যতম রূপ হচ্ছে সংঘবদ্ধ থাকা। পরিবার প্রথা ভিত্তিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত উদ্যোগ, সামাজিক বন্ধন এবং সমষ্টিগত উন্নয়ন। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় দর্শন বেশ টেকসই এবং কার্যকরী হাতিয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিচ্ছিন্নভাবে সমবায় ব্যবস্থা প্রায় শতাধিক বছর যাবৎ গ্রামীণ দারিদ্র্য লাঘবে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তিন-স্তর বিশিষ্ট সমবায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন পেশার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষক সমবায়, জেলে সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ নানা ধরনের পেশাভিত্তিক সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। এসব সমবায় সমিতির যেমন সাফল্য ছিল তেমনি নানামুখী দুর্বলতা/ব্যর্থতাও কম ছিল না। ষাটের দশকে তিন-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের পাশাপাশি দ্বিস্তর সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। মূলত আখতার হামিদ খান দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের প্রবর্তন করেন। এ ধরনের সমবায় মডেলের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আশির দশকের শুরুর দিকে এ ধরনের দ্বিস্তর সমবায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলেও বিংশ শতকের শুরুর দিকে সমবায়ের এ ধারাটিও মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯০৪ সন থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সন পর্যন্ত সমবায় পদ্ধতির নানামুখী প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও কার্যত টেকসই সমবায় মডেল গড়ে উঠেনি। সমবায় সেক্টরে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেও জাতীয়ভাবে টেকসই গ্রাম উন্নয়নের কার্যকর পদ্ধতি লক্ষ করা যায়নি। অথচ বিশ্বব্যাপী সমবায় একটি স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল।

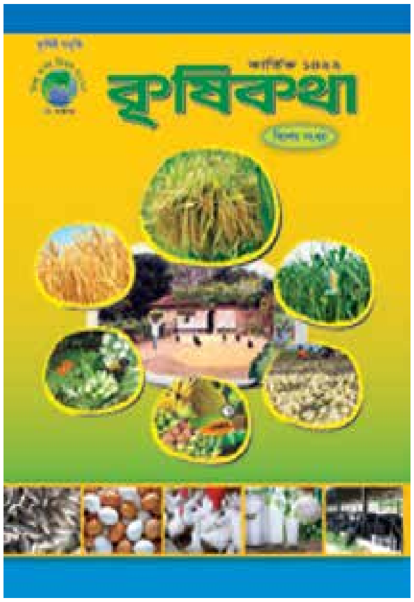

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে বেছে নেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় সমবায়ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে এ গবেষণার সফল পরিসমাপ্তি শেষে ২০০৫ সনে যখন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কাছে জাতীয় ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নের জন্য হস্তান্তর করা হয় তখন বাংলাদেশে সমবায়ের সাফল্য ব্যর্থতার ১০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ রকম একটি সময়ে দেশের ২১টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে জাতীয়ভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০০৯ সনে ২য় পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের মধ্যে রয়েছে-

উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামের সব শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত গ্রামবাসীদের গ্রামভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টা ও আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সব পরিবারের যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা ও ঝোঁক অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো

১. প্রতিটি গ্রামে একটি সমন্বিত (Comprehensive) গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা। বয়স, লিঙ্গ, পেশা এবং শ্রেণিভেদে সবার জন্য এই সমবায় সমিতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় গ্রামের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
৩. বেইজ লাইন সমীক্ষার মাধ্যমে Village Information Book (গ্রাম তথ্য বই) তৈরি করা এবং সে ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা যা বাস্তবায়নে গ্রামবাসী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
৪. প্রতিটি সমিতিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী তৈরি করা যারা গ্রাম ও সরকারি সেবা সরবরাহকারী দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করবে। একইভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সরকারের জাতিগঠনমূলক দপ্তর সমূহের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের প্লাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখবে।
৫. ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৬. সমবায় সমিতির আওতায় গৃহস্থালি কাজে সোলার প্যানেল ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ করে সৌরশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৭. গ্রামকে উন্নয়নের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

বাস্তবায়ন কর্মকৌশল

১. প্রতিটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পারিবারিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সার্বিক গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করবে।
২. গ্রাম তথ্য বই এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) বার্ষিক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন)। এই পরিকল্পনাটি Bottom up Planning এর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কাজ করে। মূলত এর মাধ্যমে তৃণমূলের মানুষ জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৩. গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বিত হবে কেন্দ্রীয় সমিতিতে এবং সামাজিক ও অবকাঠামোগত পরিকল্পনা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি ব্যাংকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।
৪. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মী থাকবে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন- কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, মহিলা, যুব, পরিবেশ, সেলাই ও হস্তশিল্প, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিংস ইত্যাদি) প্রশিক্ষিত হবে। তাঁদের মাধ্যমে ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সরাসরি তত্ত্বাবধানে সব ধরনের সরকারি সেবা ও উন্নয়ন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
৫. গ্রাম পর্যায়ে মহিলা, পুরুষ এবং ক্ষুদে সমবায়ীগণ প্রতি সপ্তাহে পৃথকভাবে সভা করে তাঁদের কাজ কর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করবে। বিভিন্ন বিষয় বা দলভিত্তিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে সমিতির কাজ-কর্ম সমন্বিতভাবে পরিচালিত হবে।
৬. প্রতিটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে একজন করে গ্রামকর্মী নিয়োজিত থাকবে। গ্রামকর্মীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে সমবায় সমিতির সাপ্তাহিক সভা (উঠোন বৈঠক), মাসিক সভা আহ্বান ও পরিচালনা করা। তাছাড়াও সদস্য অন্তর্ভুক্তি, শেয়ার-সঞ্চয় সংগ্রহ, বিনিয়োগ, ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা গ্রামকর্মীর অন্যতম দায়িত্ব। গ্রামকর্মী হচ্ছে সিভিডিপি সমবায় সমিতির মূল Focal Person.
৭. একটি উপজেলার এক-তৃতীয়াংশ সমবায় সমিতি নিয়ে এক একটি গুচ্ছ (Cluster) গঠিত হয়। প্রতি মাসে এই Cluster এর আওতায় প্রতি সমিতি হতে ৩ জন করে সমবায়ী একটি যৌথসভায় মিলিত হবে। সভায় উপস্থিত সমবায়ীরা নিজ নিজ সমবায় সমিতির বিগত মাসের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে এবং আগামী মাসের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এর ফলে সমবায়ীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিকল্পিতভাবে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে সুযোগ লাভ করে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোতে গঠিত সিভিডিপি সমবায় সমিতিতে সরকারি-বেসরকারি সেবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রদত্ত সেবা সমন্বিত হয়। ফলে গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশসহ সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। এ ধরনের সেবা চলাচলের আন্তঃপ্রবাহ নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো যেতে পারে-

গ্রামের মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, সংগঠিত হয়ে সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা, স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সরকারি এবং বেসরকারি সেবাগুলো তৃণমূল মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। নিরন্তরভাবে পরিচালিত এ কার্যক্রম গ্রামের মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির সূচকগুলোকে উর্ধ্বমুখী রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান থাকায় সিভিডিপিভুক্ত গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামের তুলনায় অধিক সচেতন, এসব গ্রামের তরুণরা অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ী এবং উদ্যোমী, নারীরা সাহসী হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে। সিভিডিপি পরিবারের ক্ষুদে সদস্যরা একদিকে সঞ্চয়ী হওয়ার দীক্ষা পাচ্ছে পাশাপাশি সামাজিক নেতৃত্বের কলাকৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে।

সিভিডিপির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠা 'সমবায় শক্তি' পারে গ্রামের প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিয়ে সমৃদ্ধ এবং আলোকিত গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে, যেমনটি স্বপ্ন দেখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মো. মফিজুল ইসলাম: চেয়ারম্যান, প্রতিযোগিতা কমিশন এবং প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

সমবায় : সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান

মিল্টন বিশ্বাস

পাল্টে যাওয়া পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আর্থসামাজিক উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে পরিচিত ও পরীক্ষিত একটি ব্যবস্থার নাম ‘সমবায়’। এই প্রত্যয়টি কতকগুলো মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ‘দশের লাঠি একের বোঝা’, ‘দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ’ কিংবা ‘বিন্দু থেকে সিন্ধু’ প্রবাদগুলোকে সামনে রেখে বাস্তবতার নিরিখে সমবায় কার্যক্রম এগিয়ে চলে। এটির মূল কাজ হলো সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন। বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত মানুষের কাছে অপরিকল্পিতভাবে পড়ে থাকা অর্থ একসাথে পুঁজি করে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে উন্নয়নই সমবায়ের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমবায় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ‘সমবায় অর্থনীতি’ গড়ে উঠেছে। এজন্যই বলা হয়, সমবায় হলো সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভঙ্গি লালন করা। আসলে একত্রিত হয়ে একসাথে কাজ করার নামই সমবায়। জনৈক অর্থনীতিবিদের মতে, ‘সমবায় হলো একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ হিসেবে সততা ও সাম্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়’; আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একে বলা হয় ‘সমবায় চেতনা’।

‘সমবায় চেতনা’র উদ্ভব ও বিকাশ শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপে। ইংল্যান্ডে ‘রচডেল’ নামক গ্রামে ১৮৪৪ সালে কিছু শ্রমিক তাঁতিদের নিয়ে গড়ে ওঠে একটি সংগঠন। এটিই প্রথম সর্বজন স্বীকৃত সমবায় সংগঠন। তবে শিল্পবিপ্লবের কিছু পূর্বে ১৭৬১ সালে সর্বপ্রথম স্থানীয় তাঁতিদের ঋণসুবিধা, শিক্ষা ও অভিবাসন সুবিধা দেবার জন্য গঠিত হয়েছিল ‘ফেনউইক উইভারস সোসাইটি’। পরবর্তীতে শুধু ইংল্যান্ডেই এক হাজারের অধিক সমবায় প্রতিষ্ঠান কর্মকাণ্ড শুরু করে। বাংলাদেশে আমরা অতিক্রম করছি সমবায় দিবসের ৪৮ বছর। অবশ্য সমবায়ের ইতিহাস এখানে একশ বছর ব্যাপ্ত। এজন্য আমরা অনুসরণ করছি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সমবায়ের ৭টি মূলনীতি। এগুলো হলো- স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ; সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ; সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ; স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা; শিক্ষা, প্রশিক্ষণ

ও তথ্য; আন্তঃসমবায় সহযোগিতা; সামাজিক অঙ্গীকার। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমবায়ের মূলনীতিসমূহ হলো—অবাধ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সদস্যপদ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, সমিতির তহবিলে সদস্যদের অংশগ্রহণের পরিমাণ যাই হোক না কেন তাদের সবারই অধিকার সমান থাকবে, উদ্বৃত্তাংশে সব সদস্যেরই অধিকার থাকবে, সমিতির সদস্যগণকে নিয়মিতভাবে সমবায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার স্পৃহা জাগরূক রাখা। সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট ওয়েন। ১৯২৫ সালে তিনি নিউ জার্মানিতে যৌথ শ্রম ও মালিকানার ভিত্তিতে সমবায় কমিউনিটি চালু করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ফ্রেডারিক নিকলসন ১৮৯৫ সালে। সমবায় আন্দোলন প্রথম পূর্ণতা পায় ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমবায় সমিতির সর্বনিম্ন সদস্য ধরা হয় ২০ জন। জেনারেল লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০৪ সালের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট পাসের মধ্য দিয়ে বাংলার গভর্নমেন্ট সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন থেকেই কৃষকদের পাশাপাশি জেলে ও তাঁতি সমপ্রদায়, ভোক্তা এবং কিছু শহুরে কম্যুনিটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনে উদ্যোগী হয়। সেসময় কৃষক ও পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে এই আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার পিসি রায়। তিনি খুলনা জেলের কিছু দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে ঞযব ইবহমধষ ঈড়-ঙঢ়বৎধঃরাব ঝড়পরবঃু অপঃ নামে একটি আইন পাস হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে জারি করা হয় 'সমবায় অধ্যাদেশ'। এর নিয়মাবলি প্রণীত হয় ১৯৮৭ সালে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে সমবায় নীতির কথা বলে গেছেন এবং বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার সমবায় নীতির পক্ষে অনেক কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অনেক। দরিদ্র নর-নারী কিংবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একটি অন্যতম পথ হচ্ছে সমবায়। সাধারণ মানুষ এখন জানেন, সমবায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেটি একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করেন। সমবায়ে সমমনা মানুষের সমাগম হয়। এটি স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিচালিত হয়। আবার একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এমনও হতে পারে যেখানে ব্যবসাটি এর সুবিধাভোগী সকলে সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তারাই ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সূত্রে দেখা যায় এদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ সমবায় সমিতির সঙ্গে জড়িত। যারা প্রায় ২ লাখ সমবায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় কিংবা আঞ্চলিক পরিসরে কাজ করছেন কিংবা অবদান রাখছেন দেশের উন্নয়নে। সমবায়ের সুবিধাগুলো হলো—সমবায়ের মাধ্যমে সহজে নিজেদের উন্নতিসহ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা যায়, শ্রমজীবী মানুষ একজনের পক্ষে যে কাজ সম্ভব নয় সমবায়ের মাধ্যমে দশ জনের পক্ষে সে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সমবায়ের সদস্যদের এবং বেকার লোকদের কর্মসংস্থান হয়, সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ের সদস্যরা সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়, সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২. একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন লালন করেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন—'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই মুক্তির সংগ্রামটি ছিল দীর্ঘদিনের। অর্থাত্ বিভিন্ন বাঁক অতিক্রম করে গড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আদর্শিক ভিত্তি ছিল একটি বৈষম্যমুক্ত, শোষণহীন সমাজ; সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ কাজে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমবায় গঠন করেন। এছাড়া তাঁতি সমবায় সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি, মিল্ক ভিটা গড়ে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।' এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ—সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরে জাতির পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সারাদেশে সমবায়ভিত্তিক নানান কার্যক্রম চালু হয়। গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর উৎসাহে জেলে, তাঁতি প্রভৃতি পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের নতুন যাত্রাপথ তৈরি হয়।

বঙ্গবন্ধুর আমলেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করা হয়। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দেন তিনি। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল—ভোগের ন্যায্য অধিকার। অর্থাত্ তাঁর আমলে সমবায় আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। সেসময় সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর। সমবায়ের পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যাশা ছিল। উপরন্তু শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি সার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবার প্রত্যয়ে ছিল দৃঢ়তা। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতে চেয়েছিলেন তিনি।

প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। লেখাবাহুল্য, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ভাষণে প্রস্তাব রেখেছিলেন, 'গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে—কৃষক, সমবায় ও সরকার।' এই গ্রামীণ সমবায়কে তিনি নতুন গ্রাম সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাদের হাতেই উন্নয়ন বাজেটের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হবে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামও থাকবে তাদের হাতে। তিনি বলেছিলেন, 'এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে।' গবেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ের কথা বলেছেন, চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কালেকটিভ ফার্মিংয়ের থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও তা সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি কৃষকদের মালিকানাধীন জমি ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেননি। বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব করেছিলেন চাষ হবে যৌথভাবে, আর সে চাষের ফসল সবাই ভোগ করবে। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাস থেকেই এই সমবায় ব্যবস্থার প্রস্তাবনা। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু নিজেই সমাজতন্ত্রে তাঁর আনুগত্যের কথা জানিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না।' তিনি ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত—শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' গরিব-দুঃখী বাঙালির মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের ব্রত। তিনি চেয়েছিলেন 'সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ-ভেদবৈষম্যহীন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের উন্নত এক বাংলাদেশ।'

১৯৭৫ সালে 'বাকশালে'র আত্মপ্রকাশ ঘটে; যার মূল লক্ষ্য ছিল একটি শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও শোষিতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ। বঙ্গবন্ধু বাকশালের মাধ্যমে 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য যে চার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলো ছিল—বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠন, মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ধনিক-বণিক শ্রেণির উচ্ছেদ, উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধন, আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন। সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন তাঁর কর্মসূচির প্রথম দফা অর্থাত্‌ 'বহুমুখী সমবায়'-এর ওপর। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণটির একটি অংশ আবারও স্মরণীয়—'পাঁচ বছরের প্ল্যান- এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।' উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা তথা সমাজের কাঠামোর আমূল রূপান্তরই ছিল বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনার লক্ষ্য। প্রাবন্ধিক যতীন সরকারের মতে, বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথেরই সমবায়-ভাবনার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'একমাত্র সমবায়-প্রণালির দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস।' এই বিশ্বাসেরই তিনি স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর 'সমবায় নীতি' শীর্ষক পুস্তিকাটিতে। 'এই কো-অপারেটিভ প্রণালিই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালি একদিন বড় হইয়া উঠিবে।... তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।' কবি কাজী নজরুল ইসলাম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তার সঙ্গেও সাযুজ্য আছে 'বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠন' ও 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাবাদর্শের। সমবায় বা যূথবদ্ধতার চেতনা বাংলার লোকসমাজের চিত্তে আবহমানকাল ধরেই জাগরূক। বিশ শতকের গোড়ায় সেই চেতনারই বাস্তব রূপদানের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন লোকসমাজের চারণ কবি মুকুন্দ দাস। সে পরিকল্পনাটি ছিল এ রকম—'প্রতি পাঁচখানা গ্রাম লইয়া হইবে এক-একটি মৌজা; প্রতি মৌজায় থাকিবে আমানতি ব্যাংক—এবং ব্যাংকের সাহায্যে ও মাধ্যমে এই পাঁচখানি গ্রামে চলিবে যৌথভাবে চাষ, কারবার ও কুটিরশিল্প।'

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। এ কারণে কৃষিকার্যে জড়িত কৃষককুল উপকৃত ও উৎসাহিত হয়। তিনি গ্রাম্য সমাজভিত্তিক গরিব কৃষকদের সহযোগিতার জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় ২২ লাখের বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেন তিনি। বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থাও ছিল। শোষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে ছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে জারীকৃত ভূমিস্বত্ব আদেশে পরিবারপিছু সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। যদিও সেই আদেশ বাস্তবায়ন করা ছিল কঠিন। আসলে ভূমিসংস্কারের বদলে সমবায়ভিত্তিক যৌথ চাষের যে প্রস্তাব তিনি করেন, তা ছিল অধিক বাস্তবসম্মত। বঙ্গবন্ধু শুধু যে যৌথ চাষাবাদের প্রস্তাব রাখেন তা-ই নয়, তিনি পুরো গ্রামকে একটি সমবায়ী ব্যবস্থাপনার অধীনে আনার কথা ভেবেছিলেন। এ কথার অর্থ, গ্রামের যাবতীয় সম্পদ—তার জমি, ফসল ও পানি-এর ব্যবস্থাপনায় থাকবে গ্রামের মানুষের যৌথ ভূমিকা। গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে যে বাড়তি আয় হবে, তার সুসম ব্যবহার ও বণ্টনের জন্য বঙ্গবন্ধু একটি 'গ্রাম তহবিলের' কথা ভেবেছিলেন। এই তহবিলের আয় আসবে উৎপাদিত ফসলের একাংশ থেকে, বাকিটা আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ থেকে। বঙ্গবন্ধুর এই সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবটি এখনো প্রাসঙ্গিক। কারণ গ্রামের ক্ষমতায়নের একটি সম্ভাব্য পথ হতে পারে গ্রামকে একটি সমবায়ী ইউনিটে পরিবর্তিত করে তাকে গণপ্রশাসনের প্রথম স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই সমবায়ী গ্রাম নিজেই যদি একটি তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট হয়ে ওঠে, তাহলে কায়েমি স্বার্থপরদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাছাড়া গ্রামের মানুষ এককাট্টা হলে দুষ্টলোকদের ঠেকানো কঠিন নয়।

৩. বঙ্গবন্ধুর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমবায় নীতি'র বাস্তবায়ন বাংলার গ্রামীণ জীবনে অনস্বীকার্য হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কারণ গ্রামীণ সমাজ হলো সংঘবদ্ধ। এ সমাজ ব্যবস্থার মূল শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত উদ্যোগ, সামাজিক বন্ধন এবং সমষ্টিগত উন্নয়ন। কবি পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন 'সমবায়' ধারণার প্রায়োগিক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রবর্তন করে। তিনি পূর্ববঙ্গে তাঁর জমিদারিকালে কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে তেভাগার দাবিতে নাচোলের 'রানি-মা' খ্যাত ইলা মিত্র কৃষক সমবায়ের নামে তেভাগা আন্দোলন করেছিলেন। আরেক সমবায় উদ্যোক্তা ড. আখতার হামিদ খান ১৯৫৬-৬০ সালে কুমিল্লায় কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের কল্যাণে সমবায়ের সুফল সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'কুমিল্লা মডেল' চালু করেন।

পরে এটিরই রূপ হয় বাংলাদেশে একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলমেন্ট' (বার্ড)। এরই ধারণা থেকে বগুড়ায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (আরডিএ) প্রতিষ্ঠা পায়। বর্তমান সরকার দেশের সমবায়ীদের উপকারার্থে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প পরিচালনা করছে। এছাড়াও 'সমবায় ব্যাংক' ও 'পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে কৃষক ও সমবায়ীদের সহায়তা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তিন-স্তরবিশিষ্ট সমবায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন পেশারভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষক সমবায়, জেলে সমবায়, তাঁতি সমবায়সহ নানা ধরনের পেশাভিত্তিক সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে। এসব সমবায় সমিতির যেমন সাফল্য ছিল তেমনি ব্যর্থতাও কম ছিল না। ষাটের দশকে তিন স্তরবিশিষ্ট সমবায়ের পাশাপাশি দ্বিস্তর সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। মূলত আখতার হামিদ খান দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায়ের প্রবর্তন করেন। এ ধরনের সমবায় মডেলের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আশির দশকের শুরুর দিকে এ ধরনের দ্বিস্তর সমবায়ের ব্যাপক সমপ্রসারণ ঘটলেও বিশ শতকের শুরুর দিকে সমবায়ের এ ধারাটিও মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯০৪ থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সমবায় পদ্ধতির নানামুখী প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও কার্যত 'টেকসই সমবায় মডেল' গড়ে উঠেনি। সমবায় সেক্টরে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হলেও জাতীয়ভাবে 'টেকসই গ্রাম উন্নয়নে'র কার্যকর পদ্ধতি বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার আমল ছাড়া অন্য সময়ে লক্ষ করা যায়নি। সমবায় কর্মকর্তা ও লেখক হরিদাস ঠাকুরের লেখার সূত্র মতে, বিশ্বব্যাপী সমবায় একটি স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যেদেশে সমবায় নীতি পালন করা হয় না। বর্তমান পৃথিবীর বেশিরভাগ উন্নয়নের পিছনে রয়েছে সমবায় সমিতির অবদান। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সমবায় নীতির মাধ্যমেই এত সমৃদ্ধ হয়েছে। এ কাতারে আমেরিকা, কানাডা, জাপান, চীন, ভারত, রাশিয়া, বেলজিয়াম, বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্র আছে। বিশ্বে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে সমবায় সমিতির সাথে জড়িত। সমবায় সমিতি শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে, দারিদ্র্য বিমোচনে, মন্দা ও দুর্ভিক্ষের সময় জনগণের মাঝে বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে অপরিসীম অবদান রেখেছে। এ অবদান সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২৯-১৯৩৩ সালের ভয়াবহ বিশ্বমন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সমবায়ের অবদান অসামান্য। উল্লেখ্য, ১৯৬০ এর দশকে সমবায়ের কুমিল্লা মডেল পল্লি উন্নয়নে নতুন যুগের সন্ধান দিয়েছিল।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রীর হিসাব অনুযায়ী কানাডা, জাপান ও নরওয়েতে প্রতি তিনজনের একজন সমবায়ী। কলামিস্ট ধীরাজ কুমার নাথ এক কলামে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে প্রতি চারজনের একজন সমবায়ী। গণচীনে ১৮ কোটি, ভারতে প্রায় ২৫ কোটি, মালয়েশিয়ায় ৫০ লক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে ৯৮ লাখ মানুষ সমবায়ের সদস্য। এছাড়াও প্রগতিশীল অর্থনীতিতে সমবায় সমিতিগুলো বিপুল অবদান রাখছে। বেলজিয়ামে সমবায় মালিকানায় পরিচালিত ওষুধ শিল্প বাজারের ১৯.৫ শতাংশ শেয়ার অধিকার করে আছে। ব্রাজিলে ৪০ শতাংশ কৃষিতে এবং কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে ৬ শতাংশ অবদান রাখছে সমবায় সমিতি। কানাডায় সমবায় সমিতিগুলো বিশ্বের ৩৫ শতাংশ ম্যাপল সুপার উৎপাদন করে। জাপানের প্রায় ৯১ শতাংশ কৃষক সমবায়ের সাথে জড়িত। কোরিয়ায় প্রায় ৯০ শতাংশ খামার চাষি কৃষি সমবায়ের সদস্য। ডেনমার্ক ও নরওয়ের ৯৫ শতাংশ দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করে সমবায়ীরা। বাংলাদেশের মিল্কভিটা বা ভারতের আমুল ও মাদার ডেইরি শ্বেত বিপ্লবের সূচনা করেছে।

৪. আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু যে সমতাভিত্তিক গ্রামীণ সমবায়ের কথা বলেছিলেন, তার উল্লেলখ না থাকলেও—বর্তমান শতাব্দীতে এসডিজির (SDG) অভীষ্ট অর্জনে সমবায়ীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় রয়েছে। আসলে সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তোলার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে। দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের টেকসই হাতিয়ার হচ্ছে সমবায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করেছে। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় আন্দোলন কয়েকটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছে। মূলনীতি হলো—একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সততা, আস্থা, বিশ্বাস, গণতন্ত্র ও সেবা। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য এদেশের মানুষের মূল্যবোধের সাথে মিল রেখে কিছু স্লোগান সামনে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। যেমন, 'একতাই বল' এবং মূল কথা হলো 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকরা সমবায় নীতি মেনে একতার সাথে কাজ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে; ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। আবার সমবায় নীতি অনুসরণ করলে মানুষের একসাথে ভাগ্য পরিবর্তন হবে সমাজের মাঝ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে। এজন্য এদেশের সমবায় নীতির গুরুত্ব বিশদ।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন। সমবায় প্রতিষ্ঠার কিছু নিয়মাবলি রয়েছে; আইন ও বিধি রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রলোভনে জনগণের অর্থ সংগ্রহ করে তা আত্মসাত্ করেছে। ফলে অনেক সমিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মানুষ; সমবায়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আর তাই সমবায়কে সঠিকভাবে দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে ২০১২ সালে একটা আইন পাস হয়। এর মাধ্যমে বলা হয় বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোর দেখভাল করবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এতে জরিমানার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপরাধীকে ৭ বছরের কারাদণ্ডসহ ১০ লক্ষ টাকার জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে দেশের মানুষ সমবায় নীতিতে আবার আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। বাংলাদেশ সরকার যথাযথভাবে সমবায় সমিতিগুলো দেখাশোনা করছে। যেমন কবি ও লেখক, নিবন্ধক এবং মহাপরিচালক আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে 'সমবায় অধিদপ্তর' তৃণমূল থেকে শহরাঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রমে নিবন্ধনসহ বিধিগত বিভিন্ন সেবা, আইনগত পরামর্শ তথা জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর। সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করা ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সমবায় অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম। অন্যদিকে সমবায় সমিতির ওপর আস্থা ফেরানোর জন্য 'আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা' প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি হিসেবে এ সংস্থা ১৯২৩ সাল থেকে প্রতিবছর জুলাই

মাসের প্রথম শনিবার 'সমবায় দিবস' পালন করে। অন্যদিকে নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার 'জাতীয় সমবায় দিবস' পালন করা হয়। এ দিন সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে মানুষকে সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। একটি তথ্য মতে বাংলাদেশের জিডিপিতে সমবায় কর্মকাণ্ড ১.৮৬ শতাংশ অবদান রাখে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। দেশে সমবায় সমিতিগুলোর প্রায় ২০ ভাগই মহিলা সমবায় সমিতি। এসব সমিতি প্রতিকূলতার মাঝেও গ্রামীণ জনপদে, কৃষি ও গৃহপালিত পশুদের নিয়ে একত্রিত হয়। এগুলো অর্থনীতির ভিত্তি এবং ক্ষুদ্র অর্থনীতিকে লালন ও সংরক্ষণ করছে; এতে নারীর ক্ষমতায়নও হচ্ছে। ঝউএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির গুরুত্ব অনেক। আর এজন্য জনগণকে সহায়তা দিয়ে চলেছে 'সমবায় অধিদপ্তর'। ২০১৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য ঝউএ-তে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য ও টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে—দারিদ্র্য থাকবে না, অনাহারি শূন্যের কোঠায়, সুস্বাস্থ্য ও সুখকর অবস্থা, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, পরিচ্ছন্ন পানি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, পরিচ্ছন্ন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, বৈষম্য কমিয়ে আনা, টেকসই শহর ও সমাজব্যবস্থা, দায়িত্বশীল উৎপাদন এবং ভোগ, জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম, পানির নিচের জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম, ভূমির ওপর জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম, শান্তি, বিচার ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানসমূহ, লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অংশীদারিত্ব।

৫. বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ 'স্বল্পোন্নত' দেশ থেকে 'উন্নয়নশীল' দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এর আগে দীর্ঘ ৪২ বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল এদেশ। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো, অতীতে শেখ হাসিনা সরকার গ্রামীণ জনপদে পরিবর্তনের অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাছাড়া এই সরকারের রয়েছে ধারাবাহিকতা। ফলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গতি পেয়েছে। গ্রামের অর্থনীতির প্রায় সমগ্রটা জুড়ে আছে কৃষি আর গ্রামীণ উৎপাদন কাঠামো, গত ১০ বছরে সেই গ্রামের উন্নয়নের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ইতিহাসের ধারায় বর্তমান সময়ে ভিন্নতর এক মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। এসময় (২০০৯-২০১৮) সরকারি বাজেটে গ্রামাঞ্চলের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অতীত ঐতিহ্য ও সামপ্রতিককালের কৃষি রূপান্তরের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নয়ন ভাবনায়ও এসেছে নতুন অভিব্যক্তি। যে অভিব্যক্তিতে 'সমবায়' অনুভাবনায় রয়েছে অনিবার্য প্রভাব।

বাংলাদেশে মোট গ্রাম আছে ৮৭,৩১৬টি। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৮,১৩৮টি। সবচেয়ে কম গ্রাম বরিশাল বিভাগে মাত্র ৪০৯৭টি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১১ কোটির বেশি লোকের বাস রয়েছে এসব গ্রামে। অর্থাত্ বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামে বসবাস করে। সমতল এলাকা ছাড়াও গ্রামীণ জনপদে রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য—কোথাও রয়েছে হাওড় ও জলাভূমি, আবার কোথাও বা পার্বত্যভূমি। আছে এদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিটমহলের নতুন বাসিন্দারা। কোথাও বা সাগরের তটরেখা বিদীর্ণ করে চলে গেছে জনবসতি। কোথাও বা অরণ্যের বৃক্ষছায়ায় বসতি গড়েছে এদেশের মৃত্তিকার সন্তান। রয়েছে নদীর বুকে ভাসমান জীবনও। মনে রাখতে হবে ভারতীয় গ্রামের উদ্ভবের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামের উদ্ভবের বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এজন্য 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রামের সেই অতীত ধারণা যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে বদলে যায় তখন বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনও বদলাতে থাকে। যদিও দীর্ঘকাল সেই গ্রাম ছিল নিস্তরঙ্গ ও পরিবর্তনশূন্য। এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার পল্লি প্রকৃতিকে ভালোবেসে লিখেছিলেন- 'একি অপরূপ রূপে মা তোমার/হেরিনু পল্লি জননী।' আর আমরা বাল্যকালে পড়েছি- 'আমাদের গ্রামখানি ছবির এতই/মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন।' বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ পাশ্চাত্য 'ভিলেজ' বা 'কান্ট্রি' ধারণা থেকে ভিন্ন। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে গ্রাম শহরের সঙ্গে সরাসরি সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সম্পৃক্ত। ব্যাপক পরিসরে গ্রামকে কেন্দ্র করে লোকালয় বা সমাজ গড়ে না উঠলেও জীবনধারণের অনেক উপকরণ সেখানে উৎপাদিত হয়। প্রযুক্তি আর যান্ত্রিক সভ্যতার আশীর্বাদে তাদের গ্রামাঞ্চলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উৎপাদন উপকরণ সংরক্ষণ ও যথাসময়ে নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করার সুযোগ-সুবিধা আছে; যাতায়াত ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে গ্রামকে কেন্দ্র করেই আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা, আধুনিক প্রযুক্তি এই সেদিন পর্যন্ত গ্রামীণ জনপদে ছিল উপেক্ষিত।

এই গ্রামীণ জনপদের অধিকাংশ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত। কৃষিকাজ যেহেতু পল্লি অঞ্চলে হয় আর পল্লির মানুষ অধিকাংশ কৃষিকাজের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো জানে না; তাই সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের একত্রিত করে তাদের কৃষিবিষয়ক শিক্ষা, অর্থ ঋণ এবং সমবায় কৃষি চাষের উপকারিতা অবগত করা এবং বিভিন্ন দেশের সফলতার গল্প জানানো এবং সেক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের করণীয় কি তা বুঝানো সম্ভব। কৃষিকাজে অনেক শ্রমিকদের দরকার হয়। কিছু সংখ্যক মানুষ যদি একসাথে ভাগ করে কাজ করে তাহলে বাইরে থেকে তাদের আর শ্রমিক আনার দরকার হয় না। বাইরের শ্রমিক আবার সময়মত পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সমবায়ী চাষের সুবিধা যে নিজেরা নিজেদের কাজ ভাগ করে প্রয়োজনীয় সময়ে সেটা সম্পূর্ণ করতে পারে। গ্রামে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায়ী কারবার গড়ে তোলা দরকার। আর তার জন্য দরকার উদ্যোক্তা। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানসিকভাবে শক্ত মানুষ প্রয়োজন। শিক্ষিত, কর্মঠ, যেমন কৃষি গ্রাজুয়েটদের একটা অংশকে সরাসরি গ্রামের সমবায়কে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা, বুঝানো, ঋণ নেওয়ার সুবিধা, অসুবিধা,

সমবায়ের সুবিধা-অসুবিধা বলা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি দরকার। সমবায়ী কৃষিকাজ করলে একসাথে অনেক জমি চাষ করা যায় সেক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনে খরচ কম হয়। আর খরচ কম হলে লোকসানের ঝুঁকি কম থাকে। লাভ-লোকসান সবার একসাথে হয় আর মানুষের ভাগ্যও একসাথে পরিবর্তন হয়। কৃষকরা যেহেতু মাছ চাষ, পশুপাখি পালন করে, ধান উৎপাদন করে এগুলোতে ঝুঁকি বেশি। অল্প সময়ের অবহেলায় এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়েছে কিন্তু দেখার কেউ নেই এবং সে জমি থেকে অন্য জমিতে রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সমবায়ী চাষ হলে একজন নির্দিষ্ট মানুষ সকল খেত দেখাশোনা করবে তাহলে জমিতে যেকোনো সমস্যা হলে দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। আবার দেখা যায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চাষ করছে; সেক্ষেত্রে সেই কৃষক নিজে অনেক টাকা দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে না। কারণ অনেক টাকা দিয়ে প্রযুক্তি কিনে ফেলে রাখতে হবে; ক্ষুদ্র জমিতে ঠিকমত চাষও করা যায় না। আর যদি ২০ জন কৃষকের সমবায় কারবার থাকে তাহলে ২০ জনের জমিতে একসাথে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে, সময় অল্প লাগবে, খরচ কম হবে; লাভ বেশি। এর ফলে মানুষ কম লাগবে আর বাড়তি মানুষ তখন অন্য পণ্য উৎপাদন করবে। বাড়তি পণ্য বিক্রি করে অর্থ উপার্জন হবে। এসব ক্ষেত্রে কৃষিতে সমবায় চাষ করা দরকার এবং কৃষকদের সমবায়ী কারবারে যোগদান করা জরুরি। ইতোমধ্যে যেসব অঞ্চলে সমবায়ী চাষ করা হয়েছে সেসব অঞ্চলের মানুষ সফল হয়েছে এবং তাদের দেখাদেখি অন্যরাও সমবায় চাষ শুরু করে দিয়েছে।

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, ঘরে ফেরা ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। বর্গাচাষিদের জন্য ঋণ, খেতমজুরদের কর্মসংস্থান ও তাদের পল্লি বেতনের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি—সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাম-ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করা। এসব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে। একইভাবে অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নে ২০১৪ সালে যেসব নির্বাচনি অঙ্গীকার ছিল তা পূরণ হয়েছে। যেমন—মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধির হার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, এসব ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য দেখেছি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট ভালো। দারিদ্র্য দূরীকরণের দিকেও যদি দেখা যায়, যা লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সরকারের অর্জন তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। যে হারে দারিদ্র্য দূরীকরণ হয়েছে, সেই হারটা অবশ্যই ইতিবাচক। এর মধ্যে মাথাপিছু আয় হয়েছে প্রায় ২,০০০ ডলার। যা ২০০৬ সালে ছিল ৫৪৩ ডলার। প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশ। একজন রিকশাচালকের দৈনিক আয় ২০০৬ সালে ছিল ২০০ টাকা, ২০১৮ সালে হয়েছে ৫০০-৭০০ টাকা। পোশাক শ্রমিকের মাসিক বেতন ২০০৬ সালে ছিল ১,৬০০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৮ হাজার। গ্রামের এই পরিবর্তন হলেও অনেক সময় গ্রামে অনেক মানুষ থাকে যারা বেকার; কোনো কাজ নেই; অলস সময় কাটায়। এ বেকারদের নিজেদের আবার অর্থও থাকে না, নিজেরা নিজেদের কাজ বের করার উপায় নেই। তখন তারা অর্থের জন্য সমবায়গুলোর দিকে হাত বাড়ায়। সমবায়গুলো বাড়তি টাকা ঋণ দিয়ে বেকারদের সাহায্য করে। দেশে বেকার সমস্যা সমাধানের একটা পথ তৈরি হয়। এভাবে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়। আবার সমবায়ের বাড়তি টাকা পরেও থাকে না, সমবায়গুলোতে লাভ আসে; সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষেরই লাভ। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাই দেশকে সাবলম্বী করে গড়ে তোলে।

একসময় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে ছিল কৃষিনির্ভর জীবন, তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। ছিল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা—মেঠোপথ আর গরুরগাড়ির প্রাধান্য। আর ছিল সনাতন কৃষি ব্যবস্থাপনা, খড়া আর জলোচ্ছাসে তীব্র খাদ্য সংকট, চরম দারিদ্র্য, সেচ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ শ্রেণির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, শোষণমূলক বর্গাব্যবস্থা। বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের গ্রামগুলোর প্রধান পরিচয় ছিল এরকম। গত এক দশকে পাল্টে গেছে গ্রামের এই পরিচিত চিত্র। এখন পিচঢালা মসৃণ পথে মোটরগাড়ি চলছে। চলে যাওয়া যাচ্ছে গ্রামের ভিতরে সরাসরি। উচ্চ ফলনশীল ধান 'উফশি' আগমনের ফলে কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এবং এর ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি রপ্তানিতেও বাংলাদেশ সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, স্বল্প জমিতে অধিক এবং বহু ফলনশীল শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি অকৃষি ক্ষেত্রেও কৃষকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামোগত ও বৈদ্যুতিক খাতে উন্নতির পাশাপাশি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সমবায়ী উদ্যোগের ফলে শোষণমূলক বর্গা ব্যবস্থার ওপর কৃষকের নির্ভরশীলতা কমেছে। এসব পরিবর্তন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রচলিত চিত্রে ভিন্নমাত্রা নিয়ে এসেছে এবং জীবনযাত্রায় বড় রকমের প্রভাব রাখছে।

সমবায়ের কল্যাণে গত ১০ বছরে গ্রামের অধিকাংশ ছনের ঘর পরিবর্তনের ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে। হারিকেনের আলোর বদলে বিজলি বাতি বা এনার্জি বাল্বের সরবরাহ বেড়েছে। তবে বিদ্যুত পৌঁছায়নি কিছু পার্বত্য ও হাওড়াঞ্চলে। অবশ্য দেশের ৯০% লোক বিদ্যুত্ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। বাকি ১০% গ্রামে বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম এই বছরের মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ১৪% মানুষ সৌরবিদ্যুত্ ব্যবহার করছে। গ্রামের ৫০-৬০ শতাংশের ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং প্রায় প্রতিটি ঘরের জন্য সুপেয় পানির বন্দোবস্ত রয়েছে। তবে কিছু জেলায় পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা এখনো জীবনযাত্রায় সমস্যার সৃষ্টি করছে। গ্রামের মানুষ এখন সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হয় না। তারা টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের মধ্যে বিনোদনের জগতে বিচরণ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পায়। এখন গ্রামের ক্ষুদ্র দোকানিরাও নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধার অনেক উপকরণ বিক্রি করে। প্রক্রিয়াজাত অনেক খাদ্য কিংবা টিভি-ফ্রিজ এখন সহজলভ্য গ্রামে। স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনেও ঘটেছে পরিবর্তন। অবশ্য আমরা জানি, কোনো গ্রামীণ পরিবারে আয়ের সিংহভাগ আসে রেমিট্যান্স থেকে। আবার কোনো কোনো পরিবারের সদস্য শহরে চাকরি করে গ্রামে তাদের পরিবার প্রতিপালন করে। গত ১০ বছরে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জীবন এবং জীবিকারও রূপান্তর ঘটেছে। অনেক মানুষের পেশার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গবেষকদের পর্যবেক্ষণে গ্রামীণ বাংলাদেশের উন্নয়নের পিছনে প্রধানতম কৃতিত্ব হচ্ছে কৃষির সাফল্য। যেমন—ভালো ফসল, দামের ওঠানামা কম, বাজারজাতকরণে সুবিধা। এরপর হলো—ক্রমবর্ধিষ্ণু কর্মসংস্থান বা মজুরিপ্রাপ্তি। তৃতীয়ত, রেমিট্যান্সের প্রবাহ। চতুর্থত, ছোট পরিবার তথা প্রজননহার হ্রাস পাওয়া। সর্বশেষ, সাক্ষরতা তথা শিক্ষার হার বৃদ্ধি। অবশ্য আমরা প্রথমেই বলতে চাই, গ্রামীণ জনপদের পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক 'অবকাঠামোগত উন্নয়ন'। গত এক দশকে পাকা রাস্তা, সেতু, স্কুল নির্মিত হয়েছে এবং বিদ্যুত্ ও সেচ সুবিধার ব্যাপক অগ্রগতি এসেছে। রাস্তা পাকা ও সুপ্রশস্ত হওয়ার ফলে গ্রাম-শহর দূরত্ব দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে অভিবাসন। এর ফলে উৎপাদন ও উপকরণ বিনিময় সহজ ও ব্যবসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। তবে এই উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

অপরদিকে শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় গ্রাম কিংবা শহরে সমবায়ী কারবারের মাধ্যমে বেশিরভাগ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। কারণ শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে অনেক অর্থ, অনেক শ্রমিক, বড় পরিকল্পনার

দরকার। একার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। আবার একা কাজ করার ঝুঁকি বেশি। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক মানুষ একসাথে কাজ করলে, সবার টাকা একসাথে কাজে লাগালে সকল দিক দিয়ে সুবিধা। উন্নত দেশের বেশিরভাগ শিল্পই সমবায়ের মাধ্যমে প্রথমে কাজ শুরু করে গড়ে উঠেছে। এমনকি বাংলাদেশের বড় বড় শিল্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সেগুলোও সমবায়ের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছিল। যেমন, স্কয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সময় চারজন ব্যক্তির সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সেটি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ওষুধ তৈরি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। তারা এখন দেশে-বিদেশে ওষুধ বিক্রি করছে। তাই কোনো কাজই সমবায় ছাড়া সফলতা পায় না। ঢাকা খ্রিষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়নও একটি বৃহৎ ও সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। মূলত সমবায়িক উপায়ে চাষাবাদ, উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, গ্রাম্য জনগণের ঐক্য ও সরকারের সহযোগিতামূলক মনোভাবই পারে গ্রামীণ জীবনের হারানো আনন্দ ও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে দিতে।

সমবায়ী আন্দোলনের প্রথম দিকে দেখা যায় বাস্তব চিত্রসমূহ। শিল্পবিপ্লব হওয়ার পর অদক্ষ শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হলো। তখন তারা একসাথে একত্রিত হয় নিজেরা কিছু করবে বলে। সবার কাছ থেকে অল্প অল্প জমানো অর্থ একত্রিত করে তারা পকিল্পনা করে কাজ শুরু করে। সেই বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকগুলো নিজেরাই শিল্পের মালিক হয়ে দ্বিগুণ শ্রম দিয়ে নিজেদের শিল্পতে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদেরকে আর অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়নি; তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন আসে। সমবায় আন্দোলন সব সময় সকল ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। মানুষ একা কখনো সব কাজ করতে পারে না তাই তাকে একত্রিত হতেই হবে। একত্রিত হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাই আলাদা; যা একা করলে সম্ভব নয়। অবশ্য সমবায়ের কিছু বাধাও আছে। বাজারজাত করার সমস্যা, বিপণন, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, অপ্রতুলতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া, আবার কিছু স্বার্থপর মানুষ এগুলোর জন্য সমবায়ের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে—তবে বাঁধাকে বাঁধা মনে করলে কোনো কাজেই সফল হওয়া যায় না।

৬. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলোকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমবায়কে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পুরস্কার প্রদান করে জনগণকে উৎসাহিত করে আসছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে হলে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের পথে এগোতে হবে। সমবায়ের অর্থনীতির ওপর সমবায়ী মানসিকতাকেও প্রাধান্য দেয়া দরকার। সেজন্য সরকারকেই প্রথম উদ্যোগ নিয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে। কৃষি, ভেটেরিনারি, পোল্ট্রি, মৎস্য, চামড়া, পাট, চা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নত শিল্প পদ্ধতি গতিশীল করা প্রয়োজন। বেকার ও যুবসমাজকে সমবায়ী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সমবায় প্রথা বা উদ্যোগ বেকারত্ব সমাধান করে মানব সম্পদে পরিণত করে। কৃষক, কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিত্তহীন মহিলা বা পুরুষ সকল শ্রেণির মানুষকে সমবায়ী শিক্ষা দিতে হবে। সমবায়কে তুলে ধরতে হবে আদর্শ কর্মপন্থা হিসেবে। এই ছোট্ট দেশে অধিক মানুষের উন্নতি ও সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো সমবায়ী কারবার করা। আর তা সঠিকভাবে করতে পারলেই বাংলাদেশ তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

অবশ্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক বাজার কাঠামো না থাকায় সমবায়ী উৎপাদনকারীদেরকে স্থানীয় বাজার চাহিদার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। স্থানীয় বাজারে নানাধরনের সিন্ডিকেটের উপস্থিতি থাকায় উৎপাদনকারীগণ পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। বরং লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগীরা। উৎপাদন ও বিপণনে সমবায় ব্যবস্থা চালু হলেই এ পরিস্থিতি থেকে কৃষকরা পরিত্রাণ পেতে পারেন। তবে সেই সমবায় ব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে নিয়মমাফিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নয়নের জন্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। পণ্য স্থানীয়ভাবে সমবায় ভিত্তিতে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে অব্যবহৃত ভূমি ও অনুপস্থিত মালিকদের জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ভূমি মালিক ও ভাগচাষি উভয়েই সমানভাবে লাভবান হতে পারে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রায় ৫ থেকে ৬ কোটি নারী বিভিন্ন ধরনের কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবদানের মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি তারা পেতে পারেন সমবায় সমিতির মাধ্যমে। এনজিওগুলো এক্ষেত্রে ফোরাম গঠন করে নারীসমাজের উন্নয়নে তথা আত্মনির্ভরশীলতায় কাজ করছে।

৭. এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তবে শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে বেছে নেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে 'বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি' (বার্ড)- কুমিল্লায় সমবায়ভিত্তিক 'সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে এ গবেষণার সফল পরিসমাপ্তি শেষে ২০০৫ সালে যখন পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কাছে জাতীয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নের জন্য হস্তান্তর করা হয় তখন বাংলাদেশে সমবায়ের সাফল্য ব্যর্থতা শতবছর অতিক্রান্ত করেছে। এ রকম একটি সময়ে দেশের ২১টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে জাতীয়ভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সালে ২য় পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উপরন্তু বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে প্রণীত সমবায় আইন/২০১৩ (সংশোধিত)-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলোর স্বতন্ত্র আইনগত ভিত্তি রয়েছে, এবং এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

বর্তমান সরকার গ্রামকে উন্নয়নের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'একটি খামার, একটি বাড়ি'র মতো প্রকল্প সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত হয়েছে সমবায় চেতনার সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে যে উন্নয়নের কার্যধারা এগিয়ে চলেছে সেখানে সমবায় দিবসের গুরুত্ব সকলেই অনুধাবন করতে সক্ষম। আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমবায় দিবস বারবারই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সব মিলে আমরা বলতে পারি, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম, অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে সমবায় দিবসের তাৎপর্য। কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—'সমবায়' সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান।

ড. মিল্টন বিশ্বাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির পিতার সমবায় ভাবনা ও কৃষিনীতি ২০১৮

প্রফেসর এম কামরুজ্জামান

কৃষি উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে। কৃষকরা সমবায়ী হলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পাবে। একতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হলে কৃষক সমাজ আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে একতাই বল। নিজের পৃথক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে অপরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার নামই একতা। একতাবদ্ধ থাকলে শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনে সাহস সৃষ্টি হয় এবং জীবনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জাতীয় সংহতি বা একতা জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির পিছনেও কাজ করছে একতাবোধ। তাই 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' এই প্রবাদ বাক্যে একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। একতার মাঝেই জাতি তথা বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমবায়ের মূলনীতিসমূহ স্মরণ করা যেতে পারে : ১. অবাধ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সদস্যপদ, ২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, ৩. সমিতির তহবিলে সদস্যদের অংশগ্রহণের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তাদের সবারই অধিকার সমান থাকবে, ৪. উদ্বৃত্ত অংশে সব সদস্যেরই অধিকার থাকবে, ৫. সমিতির সদস্যগণকে নিয়মিতভাবে সমবায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, ৬. সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার স্পৃহা জাগরূক রাখা।

বাংলাদেশের প্রায় সব পেশার লোকদের সমিতি বা সংঘ রয়েছে। অথচ কৃষকদের মধ্যে সংঘ বা সমিতি চেতনা এখনো খুবই কম। সমবায় খামার গড়ে তোলার প্রবণতা ও মানসিকতার অভাবের কারণে কৃষির অধিকতর আধুনিকায়ন ও কৃষির যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে বাংলাদেশের কৃষকের মাত্র ১.৩৪% ভাগ কৃষক সরকার নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্যে ধান বিক্রয় করতে পারে। বিগত বোরো মৌসুমের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে বাংলাদেশের যেহেতু প্রায় ৮৪% হচ্ছে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক সেহেতু তাদের মূলধন খুবই কম থাকে আর কৃষিতে যতই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে

কৃষকের জন্য কৃষিকাজ ততই ব্যয়বহুল হচ্ছে, শ্রম নির্ভর কৃষি থেকে মূলধননির্ভর কৃষিতে রূপান্তর হচ্ছে যদিও উৎপাদনশীলতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের সিংহভাগ কৃষকই দারুণভাবে মূলধন সংকটে ভুগছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক এই মুলধন সংকট লাঘবের জন্য প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে কৃষক খুব বেশী লাভবান হচ্ছে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এই মুলধন সংকট থেকে উত্তরণের একটি কার্যকর উপায় হতে পারে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। সমবায়ের নীতি অনুসারে যার জমি তারই থাকবে, কেবল সকলে একত্রে কাজ করবে ও উৎপাদিত ফসল প্রত্যেকের জমি অনুপাতে ভাগ করে নেবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভূমির খণ্ডবিখণ্ডতা হ্রাস পাবে এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হওয়ায় উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

ভারতে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেইরি ফেডারেশন অভ ইন্ডিয়া লি. সমবায়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে এই ফেডারেশনের ২৯.৭২ কোটি মার্কিন ডলার লেনদেন হয়েছে। ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে ২৭টি রাজ্য, ২১৮টি জেলা দুগ্ধ ইউনিয়ন, ১ লক্ষ ৭৭ হাজার গ্রাম দুগ্ধ সমিতি, ১ কোটি ৬৩ লক্ষ দুগ্ধ খামারিদের নিয়ে এই ডেইরি ফেডারেশন বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ফেডারেশন বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘি, পনীর, মাখন, দুগ্ধ, হে পাউডার, গুড়োদুধ, টেট্রাপেকে দুগ্ধ বাজারজাতকরণ করে যাচ্ছে। এছাড়াও জাতের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনসিমিনেশন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই ফেডারেশন দুগ্ধ খামারিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

জাপানের জেন-নোহ হচ্ছে কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের একটি ফেডারেশন। ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করে সারাদেশে ৯৪৫টি সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে পরিচালিত এই ফেডারেশনের বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১০৮ কোটি মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৪,৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। জেন-নোহ'র ব্যবসাসমূহের মধ্যে রয়েছে চালসহ দানাশস্য উৎপাদন, টাটকা ফলমূল ও শাকসব্জি উৎপাদন, কৃষি ব্যবসা কার্যক্রম, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন কার্যক্রম, ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ ও গুণগতমানসম্পন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম ইত্যাদি। উপরন্তু জেন-নোহ'র রয়েছে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র যার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ব্যবহার করে নিরাপদ ও গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ, সার ব্যবহারের অপচয় রোধকল্পে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, নতুন নতুন অ্যাগ্রোকেমিক্যালস উৎপাদন ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উদ্যানতাত্ত্বিক দ্রব্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরে প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষি যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপ স্থাপন। এছাড়াও ফিড অ্যান্ড লাইভস্টক এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট, অ্যানিম্যাল হেলথ ইনস্টিটিউট, এমব্রায়ো ট্রান্সফার সেন্টার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নেও জেন-নোহ তথা জাপান এগ্রিকালচার সমবায়ের মাধ্যমে সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। জাপান সমবায় বর্তমানে ৩৬,০০০ সমবায় সংগঠন, ৮০ মিলিয়ন সদস্য এবং ৬ লক্ষ ৪০ হাজার কর্মচারীর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড কো-অপারেটিভ মনিটর এর তথ্য মতে প্রায় ৩ মিলিয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১২% মানুষ সমবায়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন। বিশ্বের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় ১০% জনসংখ্যার সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাঝে শীর্ষ ৩০০ কো-অপারেটিভ সোসাইটির বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ২,০৩৪.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সমবায়ের সকল খাত মিলিয়ে শীর্ষ ৩০০ সমবায় সমিতির মাঝে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান হচ্ছে ৩১.৭%। এ প্রেক্ষিতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমবায় সমিতির মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী কৃষকগণ সংগঠিত হচ্ছেন, উৎপাদন এবং বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টেকসই উন্নয়ন এর ৮ নং অভীষ্ট হচ্ছে সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। সমবায়ের মাধ্যমেই এই অভীষ্ট দক্ষতার সাথে অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু এই অভীষ্টের সাথে ১ নং অভীষ্ট সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান, ২ নং অভীষ্ট ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার, ৫ নং অভীষ্ট জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, ১০ নং অভীষ্ট অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা, ১২ নং অভীষ্ট পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ইত্যাদির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুতরাং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা অতীব জরুরি।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

সমবায়ের এ অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার সামনে বলেছেন 'নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান- এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ- এ জমির মালিকের জমি থাকবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেষ্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ-বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারে কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সম্পর্কে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেই নির্দেশনা অনুযায়ী সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক।

৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন 'সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন- যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি

লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।'

জাতির পিতা আরো বলেছেন 'আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা- দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী সার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গ্রামাঞ্চলের বাধ্যতামূলক উৎপাদনমুখী সমবায়ের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ নভেম্বর ২০১৯ সমবায় দিবসে বলেছেন যে, সমবায়ের সদস্যবৃন্দ যেসব পণ্য উৎপাদন করছে সেগুলো শিল্প কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে যদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারে তাহলে গ্রাম বাংলা আর অবহেলিত থাকবে না। দেশের কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সমবায়ের যোগসূত্র স্থাপন করা গেলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। চাষোপযোগী কোনো জমি অনাবাদি থাকবে না। দেশের উন্নয়নে যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাটি, জল, বায়ু ও পরিবেশের সমন্বয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। সমবায়ের মূল চেতনা হলো সম্মিলিত উদ্যোগ। একার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় তা সম্মিলিত উদ্যোগে সহজে করা যায়।

এ প্রসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চের ভাষণ পুনরায় স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন 'আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাকসেসফুল করার জন্য কাজ করতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই সকলকে চাই।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন সমবায় হলো একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র, উৎপাদন, সুশাসন, আন্দোলন, চেতনা ও আদর্শ এবং ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ তার প্রমাণ। জাতির পিতার সেই আদর্শকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে প্রণীত কৃষি নীতিতে কৃষি সমবায় ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেই আলোকে কৃষি নীতি ২০১৮ এর ১৬ অনুচ্ছেদে কৃষি সমবায়কে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৬.১ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে স্বপ্রণোদিত সমবায় বা গ্রুপভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহ ও সহযোগীতা প্রদান করা'। ১৬.৪ উপ-অনুচ্ছেদে সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে 'কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়ভিত্তিক বিপণনকে সহযোগীতা ও উৎসাহ প্রদান করা'। এক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কৃষি অর্থনীতিবীদদের সম্পৃক্ত করে কৃষি বিপণন ও কৃষি সমবায় অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। ১৬.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কোন জমি পতিত বা অনাবাদি না রেখে অনিবাসি ও অনুপস্থিত জমির মালিকদের কৃষি উপযোগী জমি সমবায় ব্যবস্থায় চাষের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার জাতকরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য হতে অর্জিত লভ্যাংশ জমির মালিক, কৃষি শ্রমিক ও সমবায়ের মধ্যে যৌক্তিক হারে বিভাজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।' এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র ১৩ এপ্রিল ২০২০ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন 'এই দুঃসময়ে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু সচল রাখা নয়, আরও জোরদার করতে হবে। সামনের দিনগুলিতে যাতে কোন প্রকার খাদ্য সঙ্কট না হয়, সেজন্য আমাদের একখন্ড জমিও ফেলে রাখা চলবে না।' এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি সমবায় ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। এছাড়া, বিদ্যমান সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে কৃষি সমবায়কে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় ব্যাংককে যদি কার্যকর করা যায় এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার উন্নয়ন অভিযাত্রা সার্থক হবে সফল হবে।

প্রফেসর এম কামরুজ্জামান: কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
ইমেইল : kamruzzaman@bsmrau.edu.bd

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও যৌথ কৃষি খামার প্রসঙ্গে

ড. জাহাঙ্গীর আলম

সমবায় হলো স্বপ্রণোদিত হয়ে মিলিত স্বার্থে গড়ে তোলা সংগঠন, যেখানে এর সদস্যরা পারস্পরিক স্বার্থে সেবাসমূহ প্রদানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। এটি মুনাফাভিত্তিক সংগঠন হলেও এর সদস্যরা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এটি গঠন করে থাকে। এ সংগঠন আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সদস্যদের যৌথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। যা সদস্যদের দ্বারা এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। একটি সমবায়ের মধ্যে বিনিয়োগ ও পরিচালন ঝুঁকি, লাভ অথবা লোকসানের দায়ভার সদস্যগণ তাদের অংশীদারিত্ব ও প্রদেয় সেবার আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়। সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনৈতিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জাতীয় উন্নয়নে, কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রেও সমবায় অত্যন্ত কার্যকর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায়ের রূপরেখা ভিন্নতর। ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলোতে বাজার অর্থনীতির অবয়বে পরিচালিত হয় সমবায়। এক্ষেত্রে সদস্যরাই সমবায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারাই এর পরিচালনার নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমবায়ের উদ্যোক্তা রাষ্ট্র। এর মালিকানা নিয়ন্ত্রিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের সহায়তায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে উঠে সমবায়। একে উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহন হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষের আর্থিক সংকট সমাধানের জন্য ও কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায়কে একটি অনন্য পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯০১ সালের 'ফেমিন কমিশন রিপোর্ট' ভারতে সাধারণ মানুষের আর্থিক দৈন্য ও ঋণগ্রস্ততা নিরসনের পথ হিসেবে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। ব্রিটিশ কর্মকর্তা নিকলসন জার্মানির রেইফারসেন মডেলের অনুকরণে ভারতে

‘এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভস’ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯০৪ সালে ‘কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট’ পাস করে বাংলার সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। প্রথম দিকে সরকারের কাছ থেকে ধার কিংবা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সোসাইটির জন্য অর্থসংস্থান করা হতো। সমিতির সদস্যরাও তাতে টাকা গচ্ছিত রাখতো। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত সুদমুক্ত ছিল সরকারি ঋণ। গ্রামভিত্তিক সোসাইটিগুলো উপযুক্ত প্রার্থীকে ঋণ দিত। কৃষক, জেলে ও তাঁতিরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই সময় কৃষক ও পেশাজীবী মানুষের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন থানা ও মহকুমাতে সমবায় গড়ে উঠতে থাকে। পরে উৎপাদক, ভোক্তা ও বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সেবাপ্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সমবায়ের কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৯১২ সালে নতুন কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট জারি করা হয়। এর পরও বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের প্রকৃতি ও পরিসরে অভিযোজন ঘটেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় বিভাগের অধীনে চিরায়ত সমবায় এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে কুমিল্লা একাডেমি উদ্ভাবিত দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় চালু আছে।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ী উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানাখাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে উৎপাদনখাত, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনব্যবস্থাসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দেশের জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লির কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি।’

দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ, কৃষকদেরকে যান্ত্রিক চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সুসম বণ্টন এবং দেশের বেকার যুবসমাজকে কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমবায় ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সমবায়কে তিনি বেছে নেন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ হিসেবে। তার লক্ষ্য ছিল গ্রামভিত্তিক বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা। তাতে উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। তবে তিনি জমির মালিকানা কেড়ে নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং জমির মালিকানা কৃষকদেরই থাকবে বলে তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে তিনি কৃষকের ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত জমি এক সঙ্গে করে যৌথ কৃষি খামার গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যাতে আধুনিক চাষাবাদ সম্ভব হয়। যান্ত্রিকীকরণ সহজ হয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ; এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার যে অংশ বেকার, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্টরিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে, আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এ জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি যে, ৫ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।’ গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, ‘রাষ্ট্র তোমাকে ঋণ দেবে, টাকা দেবে, ইনপুটস দেবে, তোমাকে সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। সেটা করে দেবে তুমি যদি এই ধরনের সমবায় কর। সমবায়ের ফল দিয়ে যে উৎপাদনশীলতা বাড়বে তার সুফলটা যেমন পাবে জমির মালিক তেমনি এটার অংশ পাবে যারা ভূমিহীন কৃষক, যারা ওখানে শ্রম দেবে তারা। যারা এখানে বিনিয়োগ করবে, তারাও এখানকার একটা অংশ পাবে।’ (মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু, ট্রাজেডি, রাষ্ট্রচিন্তা, উন্নয়ন দর্শন। নূহ-উল আলম লেনিন, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১০৭)।

বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি যে পুঁজিবাদ বিরোধী চিন্তা ও চেতনা লালন করতেন এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন তা তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি মানুষে মানুষে বৈষম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণই ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বাংলাদেশকে শোষণ মুক্ত করা। এ সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট ভাষায় তিনি বৈষম্যের ফিরিস্তি দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের এক জনসভায়। এ বৈষম্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন, সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছে ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করেছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছে ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইল। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল। অথচ ঢাকার একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোন হেলিকপ্টার এলো না। আমরা এসব বেইনসাফির অবসান করব।’ বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের আর্থিক বঞ্চনা, কৃষকদের কষ্ট ও দারিদ্র্য এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্য নির্মূলে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সে কারণেই আমাদের সংবিধানের চতুর্দশ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, ‘‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা।’’ এর জন্যই তিনি স্বাধীন দেশের সংবিধানে ‘সমাজতন্ত্র’ কথাটি সংযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘সমাজতন্ত্র আমাদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র না হলে এদেশের দুঃখী মানুষের বাঁচবার উপায় নেই। আমরা শোষণহীন সমাজতন্ত্র চাই।’ তবে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কৌশল ছিল তার নিজস্ব। অন্য কোন দেশ থেকে ধার করা নয়। তিনি গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলেছিলেন। একে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ‘মুজিব বাদ’ হিসেবে। এখানে তিনি একজন অনন্য জাতীয়তাবাদী নেতা। গান্ধীজির মতো স্বদেশি। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের নবগঠিত বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘‘এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলছি, সে অর্থনীতি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কোন জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইমপোর্ট করে এনে কোন ইজম চলে না। এদেশের কেন, কোন দেশেই চলে না। আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আমার

ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ, আমাদের দেশে অনেক সুবিধা আছে। কারণ আমার মাটি কী, আমার পানি কত, আমার এখানে মানুষের কালচার কী, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্ল্ড। বঙ্গবন্ধু দেশের গ্রামীণ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার বিপ্লবকে এক সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। একটির সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত, একে অপরের পরিপূরক। দেশের গ্রামীণ উন্নয়নকে সফল করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত গ্রাম ভিত্তিক বহুমুখী কৃষি সমবায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল যৌথ কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত জমির একাত্রীকরণ। যাতে যান্ত্রিক চাষাবাদ সম্ভব হয়। উপকরণ সংগ্রহ ও আর্থিক সংস্থান সহজতর হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কর্মহীন যুবকদের কর্মসংস্থান করা যায়। সর্বোপরি গ্রামীণ আয় বৈষম্য নিরসন সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে সত্তর এর দশকের প্রথম ভাগে কিছু মাঠ গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে কুমিল্লার বামইল প্রকল্প, ময়মনসিংহের শিমলা যৌথ খামার প্রকল্প, চট্টগ্রামের রাঙুনিয়ায় গুমাইবিল প্রকল্প এবং রাজশাহীর গুরুদাসপুর প্রকল্প অন্যতম। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ওই প্রকল্পগুলো অস্তিত্ব হারায়। এদের সমস্যা ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা, যৌথ কৃষি খামারের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক দিক বিশ্লেষণ করা এবং দেশে সমবায় কৃষি খামারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সত্তর এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ কিছু সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লা একাডেমিতে, ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৩ সালের মে মাসে চট্টগ্রামের রাঙুনিয়ায় অনুষ্ঠিত সেমিনারসমূহ উল্লেখযোগ্য। ওই সকল সেমিনারের আলোচনা ও সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে যৌথ কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রণয়নে কাজে আসতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো বঙ্গবন্ধুর যৌথ কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় আজও প্রাসঙ্গিক। শিমলা প্রকল্পের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থেকে এবং এ নিয়ে গবেষণা করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যৌথ কৃষি খামার ব্যবস্থাকে খুবই কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে মনে হয়েছে আমার। বর্তমানে শ্রমিক সংকট নিরসন ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য এটি একটি উত্তম পন্থা হতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

ড. জাহাঙ্গীর আলম : কৃষি অর্থনীতিবিদ। উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। গবেষণা ক্ষেত্রে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদক' ২০২০ প্রাপ্ত।

করোনা আক্রান্ত কৃষি অর্থনীতি এবং সমবায়ের ভূমিকা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটির মত। অন্যদিকে জাতিসংঘের হিসাব মতে, বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে। তাম্মধ্যে কানাডা, জাপান ও নরওয়েতে প্রতি তিনজনে একজন সমবায়ী। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে প্রতি চারজনে একজন সরাসরি যুক্ত সমবায়ের সঙ্গে। জাপানে কৃষিকাজে নিয়োজিতদের ৯০ শতাংশ সমবায়ী। তাছাড়া গণচীন, ভারত ও মালয়েশিয়ার জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ সমবায়ী। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট সমবায়ীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি। মোটকথা, ধনী-গরিব সকল দেশে সমবায় সমিতির সাফল্য গাথা নজিরবিহীন। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদরা বিশ্বাস করেন একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় রোধকরণে অন্যতম পরীক্ষিত পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন উদ্যোক্তা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটিশ শাসনামলে পাক ভারত উপমহাদেশে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে নিষ্পেষিত কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও দরিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অ্যাক্ট" জারির মাধ্যমে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। কালের পরিক্রমায় এই সমবায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে সমাদৃত হতে থাকে। এদেশে সমবায়ের বয়স প্রায় ১১২ বছর বা তারও বেশি। ধীরে ধীরে সমবায়ের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৫২ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ত্রয়োদশাংশ সরাসরি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হলে দেশ অচিরেই দারিদ্র্য মুক্ত হবে। সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে একত্রিত করে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা যায়। যেমন- গাভি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, গরু, মহিষ,

ছাগল, ভেড়া, দুম্বা পালন ও মোটাতাজাকরণ, হাস-মুরগি ও কোয়েল পাখি পালন, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, মৎস্য চাষ, লবণ চাষ, তাঁত ও কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা কঠিন কোনো কাজ নয়। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কলকারখানা স্থাপন করে দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করা সম্ভব।

আমাদের দেশের প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটির বেশি লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। আর তাদের পাঠানো রেমিটেন্স ও গার্মেন্টস খাতের আয়ের মাধ্যমে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। করোনাপরবর্তী রেমিটেন্স ও গার্মেন্টস সেক্টরের আয় কমে গেলে এ প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হবে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি চাকরি হারিয়ে দেশে চলে আসবে। এসকল প্রবাসী ও গার্মেন্টসের চাকরি হারানো জনগণকে উৎপাদনমুখী কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য সমবায় হতে পারে অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সরকার এসকল প্রবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের লব্ধকৃত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নত বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে পারে। এতে করে সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং খাদ্য আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে। বীজ ও সার বিতরণে সরকারকে নানা ঝামেলা পোহাতে হবে। সরকারের উচিত এই সার ও বীজ বিতরণে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সহায়তা গ্রহণ করা। বর্তমানে দেশে প্রায় ১.৭৭ লাখ সমবায় প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এ সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যারা কার্যকর সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মাধ্যমে এ কঠিন কাজটি করা অনেক সহজ হবে। এ কঠিন কাজটি আরো সহজ করার জন্য যৌথভাব কৃষি মন্ত্রণালয়, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তাতে করে সরকারের যে খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা তা সহজে অর্জন সম্ভব হবে এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এমনিভাবে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী যেমন : গম, ভুট্টা, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী যেগুলো আমরা এখন আমদানির মাধ্যমে আমাদের চাহিদা পূরণ করে থাকি তা যদি এসকল সমবায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমাদের আমদানি ব্যয় কমবে এবং আমাদের খাদ্য ঘাটতি রোধ করতে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও দেশের মোট আবাদযোগ্য ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর জমির খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের ৪,৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়নভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তির কৃষি উপকরণ বিতরণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করলে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সমস্যা সহজে সমাধান করা যাবে। ওইসব সমবায় সমিতিগুলোর মালিকানায় থাকবে ওই ইউনিয়নের সকল ভোটার। এতে করে সেই ইউনিয়নের আয়-বৈষম্য দূর করা সহজ হবে। আর এ কাজটি সঠিকভাবে করতে না পারলে করোনা পরবর্তী খাদ্য সমস্যা দূর করা সরকারের জন্য কঠিন হবে। এছাড়াও সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন সহায়তা এসকল সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা গেলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করা যাবে।

আশির দশকের শুরুর দিকে এ ধরনের দ্বিস্তর সমবায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলেও বিংশ শতকের শুরুর দিকে সমবায়ের এ ধারাটিও মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সমবায় পদ্ধতির নানামুখী প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও কার্যত টেকসই সমবায় মডেল গড়ে ওঠেনি। সমবায় সেক্টরে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হলেও জাতীয়ভাবে টেকসই গ্রাম উন্নয়নের কার্যকর পদ্ধতি লক্ষ করা যায়নি। অথচ বিশ্বব্যাপী সমবায় একটি স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে বেছে নেয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে রাষ্ট্রে উৎপাদনযন্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা—এ তিন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা সংবিধানে স্বীকৃত। সমবায়ী মালিকানা হচ্ছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা, যা সমষ্টিগত বা যৌথ মালিকানা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, কেননা সমবায়, সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলের দ্বারা দুর্বলকে শোষণ থেকে মুক্ত করে তার ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। যুগোপযোগী সমবায় নীতির আওতায় বিকশিত সমবায়ের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে সামাজিক সাম্য ও সমতা অর্জনসহ মালিকানা সম্পর্কিত সাংবিধানিক স্বীকৃতির সফল রূপায়ণ সম্ভব। দেশের সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এর উপযোগিতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে সমবায় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এসব উদ্দেশ্য এবং সমবায় আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিকে গণমুখী ও বহুমুখী করার উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে জাতীয় পল্লি উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন এবং অর্থনীতিতে সমবায়ের প্রভাব ও পরিমাণ বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সমবায়বান্ধব নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সমবায় নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প নেন। এসব প্রকল্প ও উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৬০০ সমবায় সমিতি বিদ্যমান; আর এসব সমবায় সমিতিতে প্রায় ১ কোটিরও বেশি সমবায়ী রয়েছে, যার ১৮ শতাংশ নারী সমবায়ী। এ বিপুলসংখ্যক সমবায়ীকে একই সুতায় বেঁধে রেখেছে সমবায় দর্শন। আর এ দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সমবায়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিশ্বদরবারে উঁচু স্থানে নেয়া সম্ভব। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অত্যন্ত কার্যকর উপায়। বর্তমান সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেখানে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে তা আরও টেকসই হবে। সরকার বিগত দিনে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা ধরে রাখার জন্য সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে দেশে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন টেকসই হবে।

দেশের সমবায়ী কৃষককে কৃষিঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তৎকালীন সমবায়ী কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক দেশের অতি পুরনো ব্যাংক হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ব্যাংকটিকে স্পেশালাইজড ব্যাংক-তফসিলি

ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি; ফলে সমবায় সমিতিগুলো তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বড় পরিসরে কোনো ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। সমবায় ব্যাংকটিকে সত্যিকারের সমবায়ীদের ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গতিশীল করতে না পারলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। এ ছাড়াও দেশের সব জেলা-উপজেলায় সরকারি ও সমবায়ী মালিকানায় যেসব সম্পদ রয়েছে, তা উদ্ধার করে এখনই সরকারি ও সমবায় মালিকানায় সমবায় হাসপাতাল, সমবায় বিপণিবিতানসহ বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় দৃশ্যমান হবে। সমবায় সমিতি/সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও উন্নয়নমুখী করতে পারলে দেশ দ্রুত সমৃদ্ধশালী হবে। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় দেড় কোটি মানুষ জড়িত। এই দেড় কোটি মানুষের তিন কোটি হাতকে কার্যক্ষম করতে পারলে দেশকে উন্নয়নের উচ্চতায় এগিয়ে নিতে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। সমবায় একটি শক্তি, সমবায় উন্নয়নের একটি নেটওয়ার্ক। সারা দেশের সমবায়ীদেরকে এই নেটওয়ার্কে সম্পৃক্ত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ, জাতির জনকের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সমবায় সেক্টরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে গণতন্ত্র, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যাপক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস। আধুনিক কৃষির জন্য যে পুঁজি, ঝুঁকি এবং যৌথ উদ্যোগ দরকার তার জন্য প্রয়োজন গণমুখী কৃষিভিত্তিক সমবায় ব্যবস্থা। খাদ্য নিরাপত্তা ও মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হলে কৃষি সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ নীতি এবং সার্বিক সহযোগিতা পেলে কৃষি সমবায় দেশে খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টিতে অন্যতম এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো সমবায়ী উদ্যোগ। এজন্য প্রয়োজন সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের জন্য, নিজের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা। All for each and each for all এই মর্মবাণী ধারণ করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সবার একান্ত দায়িত্ব।

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সব শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সময়োপযোগীকরণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় নিকট ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশও সমবায়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলে, অনুপ্রাণিত হলে ড. আকতার হামিদ খানের প্রণীত পল্লি উন্নয়নের কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে একমাত্র সমবায়ী চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো কঠিনতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা উপহার দিয়ে বিশ্ব দরবারে তাকে এক সুনাম ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ : কলামিস্ট ও গবেষক। সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

করোনাকালে টিকে থাকার অর্থনীতি ও সমবায়

আবু তাহির মুস্তাকিম

করোনা ভাইরাসের থাবায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি। ভেতরে-বাইরে চলছে রক্তক্ষরণ। চারদিকে চলছে হাহাকার। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। গণমাধ্যম জানাচ্ছে যে, অভাবের তাড়নায় অন্তত ১৬ শতাংশ মানুষ শহর ছেড়েছে। এখনও ছাড়ছে। ২০২০ মার্চে লকডাউন ঘোষণার পর মাত্র তিন মাসে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

কবে যাবে করোনা মহামারি? এ নিয়ে তিনটি তত্ত্ব আছে।

প্রথমত, দুই বছরের মধ্যে এ মহামারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মারা যাবে প্রায় দশ লাখ মানুষ। মানুষ দ্রুতই এই বিভীষিকা ভুলে তাদের পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাবে। অবশ্য ২০২০ সেপ্টেম্বরে বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। শুরু হয়েছে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ধাক্কা।

দ্বিতীয়ত, এ মহামারি প্রায় পাঁচ বছর স্থায়ী হতে পারে। মারা যেতে পারে দশ কোটি মানুষ। এর ধাক্কা সামলাতে লাগবে আরও পাঁচ বছর। অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা অনেক কঠিন হবে। যেমনটি ঘটেছিল স্প্যানিশ ফ্লু মহামারির পর।

তৃতীয়ত, মহামারি দশ বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারে। দশ থেকে তিরিশ কোটি মানুষ মারা যাবে। ইত্যাদি।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বলছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশে প্রায় চার কোটি নতুন দরিদ্র তৈরি হবে। গ্রামাঞ্চলে এই নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হবে প্রায় তিন কোটি এবং শহরাঞ্চলে এক কোটি। বর্তমান দারিদ্র্য হারের সঙ্গে এই বিপুল নতুন দরিদ্র মিলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার হতে পারে ৪১ শতাংশ।

৬০ লাখ চাকরি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য হারিয়ে যাবে। যা দেশের মোট শ্রমশক্তির ১০ শতাংশ। করোনার প্রভাবে দেশে ৯৫% পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত, বলছে ওয়ার্ল্ড ভিশন। বড় বড় ব্যবসাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতকে টিকিয়ে রাখতে সরকারিভাবে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণের জন্য

কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। আর একটি উন্নয়নশীল দেশের সব ক্ষেত্রে সরকারের নজর দেয়াটা কঠিন। তাই নিজেদের সচ্ছলতা বাড়াবার উদ্যোগ নিজেদেরই নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

ধরা যাক, মহামারি দুই বছর স্থায়ী হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য কি কি করা যেতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। এ নিয়ে শুরু হোক আলোচনা। সম্ভাব্য যত দিকে পারা যায় যোগাযোগ করতে হবে। তথ্য জোগাড় করতে হবে। তথ্য বিনিময় করতে হবে। রীতিমতো গবেষণার ভিত্তিতে এগোতে হবে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সবার সাথে আলোচনায় একেকজনের একেক ধরনের পরামর্শ, দক্ষতা, যোগাযোগ ও পরামর্শ বেরিয়ে আসবে। এদের কেউই ফেলনা না, কারও পরামর্শই তুচ্ছ না। এদের নিয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে গুরুত্ব অনুসারে করণীয় তালিকা করতে হবে।

এটা অনেকটা ইতিহাসের পুনর্পাঠের মত। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারান। এসময় ইংল্যান্ডের 'রচডেল' গ্রামের ২৮ জন তাঁতি ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামেন। গড়ে তোলেন ইতিহাসের প্রথম সমবায় সমিতি। ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত।

ইতিহাস বলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বৈরি পরিস্থিতিতে সমবায়ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে টিকে ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষ। এ কাজের বিস্তার দেখে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন সমবায় ঋণদান সমিতি আইন জারি করেন। ইতিহাসের পথ ধরে দেশে মূলত ২৯ ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, গৃহায়ন, পরিবহন, দুগ্ধ উৎপাদন, ঋণ ও সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে প্রায় পৌনে দুলাখ। এসব সমিতির মাধ্যমে প্রায় সাত লাখ লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে সমবায়ী এককোটিরও বেশি মানুষ। এসব সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের সাথে সরাসরি যুক্ত। আর এসব সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশই মহিলা সমবায় সমিতি।

মহামারিকালীন এ সময়ে স্বজনদের নিয়ে গড়ে তোলা সমিতির সদস্য গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিবেচনায় নিয়ে এগোতে হবে। দশজন বা বিশজন করে সদস্য নিয়ে একেকটি ইউনিট হতে পারে। রীতিমতো ব্যবসায়ী ইউনিট। প্রতিটি ইউনিটের একজন প্রধান থাকবেন। এই প্রধানের নেতৃত্বে কাজ করবে একেকটি ইউনিট। এসব ইউনিট সম্ভাব্য ব্যবসার পুরো রূপরেখা তুলে ধরবে। প্রতিটি ইউনিট সদস্য পুরো সমবায় সমিতির সবকটি ব্যবসার অংশীদার হবেন। সবচেয়ে কম পুঁজিতে বেশি লাভ কিভাবে সম্ভব তা খুঁজে বের করবে প্রতিটি ইউনিট।

ধরা যাক, প্রতিজন ইউনিট সদস্য প্রাথমিকভাবে ২,০০০/ টাকা করে বিনিয়োগ করলেন। তা দশটি ইউনিটের সম্ভাব্য দশটি ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করা হবে। এবং প্রতিটি ব্যবসার মুনাফা সমান হারে ভাগ করা হবে। যত বিনিয়োগ, তত লাভ। তবে ক্ষতির দায়ও আনুপাতিক হারে সবার জন্য সমান হবে। সবগুলো ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। তবে সব ইউনিট একই ধরনের ব্যবসা করবে না। কোনো একটি ইউনিট মার খেলে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটটিকে অন্য ইউনিটগুলো টেনে তুলবে।

আর এসব ব্যাপারে এ নতুন উদ্যোক্তারা স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলো এবং তাদের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কথা বলতে পারেন ব্যবসায়ী নেতা বা ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে। কোন ব্যবসা লাভজনক আলোচনার সময় ব্যবসায়ী নেতারা তা তাদের জানাতে পারেন। আর ব্যাংক কর্মকর্তারা তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থের নিরাপত্তা বা আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসতে পারেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওইসিডিও মনে করছে, বৈশ্বিক জিডিপি ঘুরে দাঁড়ানোটা নির্ভর করছে অর্থনীতির গড়নের উপর। পর্যটন, হোটেল-রেস্তোরাঁসহ সেবাখাতের জন্য সময়টা সঠিক না। তাদের মতে, অর্থনীতি উৎপাদনভিত্তিক হলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে। বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। ফলে অনিশ্চয়তা থাকবে। অর্থনীতিও গড় মানের চেয়ে আরও অনেক দিন নিচেই থাকবে।

এদিকে, গবেষণায় বলা হচ্ছে করোনা পরবর্তী সময়ে কৃষি, খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ, তৈরি পোশাক, চিকিৎসা-সামগ্রী উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও ফার্মাসিউটিক্যালস, যানবাহন, নির্মাণ, খুচরা ব্যবসা ইত্যাদি খাত আগে ঘুরে দাঁড়াবে।

এর মধ্যে অনেকগুলো খাত রয়েছে যা বেশ ব্যয়বহুল। তাই অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে টিকে থাকার অর্থনীতির জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন :

ফসল ও সবজি চাষ

করোনা পরিস্থিতিতে প্রথম এবং প্রধান বিষয় খাদ্য নিরাপত্তা। প্রবাস ফেরত ও বেকাররা হাত লাগালে এ খাতে রীতিমতো কৃষি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিয়ে এগোনোটাই ভালো। তাদের সাথে আলোচনা করে কোন এলাকায় কোন ফসল বা সবজি ভাল ফলবে তা নির্ধারণ করবেন উল্লিখিত ইউনিট প্রধানরা।

বুদ্ধিমান কৃষকরা একই জমিতে একইসাথে একাধিক ফসল ও সবজি চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন। যেসব জমি পতিত আছে তা ইজারা নিয়ে কাজের আওতা বাড়িয়ে সমৃদ্ধিও জোরদার করা সম্ভব। গম, ভুট্টা, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ যেগুলো আমদানি করতে হয় তা পরিকল্পিতভবে উৎপাদন করা যেতে পারে। এতে করে আমদানি ব্যয় কমবে এবং খাদ্য ঘাটতি রোধ করা যাবে। এ কাজ সঠিকভাবে করতে না পারলে করোনাকালীন তো বটেই তার পরবর্তী সময়েও খাদ্য সমস্যা কঠিন হয়ে উঠবে। পাশাপাশি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আশঙ্কাও জোরদার হবে।

রাজধানী বা বড় শহরগুলোতে বসবাসকারীরা হয়ে উঠতে পারেন নগর চাষি। বহুতল ভবনে ছাদবাগানের পাশাপাশি নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দার টবে বা বাড়ির ভিতরে সবজি উৎপাদন করতে পারেন তারা। শহরগুলোতে অনেকেরই পরিচিত ল্যান্ড ডেভোলপার রয়েছেন। তাদের অনুমতি নিয়ে পড়ে থাকা জায়গায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌথভাবে নানা ধরনের ফসল বা সবজি চাষ করা যেতে পারে।

মাছ, হাঁস-মুরগি, ডিম উৎপাদন

ফসল ও সবজি চাষের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু মাছ-মাংস বা পুষ্টির কী হবে? সমিতির নেতারা পরিকল্পিতভাবে মাছ, হাঁস-মুরগি, ডিম উৎপাদনে যেতে পারেন। কোন্ ইউনিট শুধুমাত্র ফার্মের মুরগি ও ডিম তদারক করবে, কোন্ ইউনিট দেশি হাঁস-মুরগি তত্ত্বাবধান করবে, কোন্ ইউনিট মাছ উৎপাদনে যাবে তা আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে অভিজ্ঞজনদের সাথে আলোচনা করে একই পুকুরে মাছ, হাঁস ও পুকুরের পাড়ে সবজি চাষ করা যেতে পারে। নিয়মিত পুকুরের পাশাপাশি হাজা-মজা পুকুর ইজারা নিয়ে তা মাছ চাষের উপযোগী করতে হবে। এ পুকুরের পাশে মাচান বেঁধে তাতে হাঁসের থাকার ও প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাচানে হাঁসের পাশাপাশি ডিমের উৎপাদন বাড়বে। আর মাচান থেকে পানিতে পড়া হাঁসের বিষ্ঠা মাছের বাড়তি খাবার হিসেবে যোগ হবে।

এসব উদ্যোগের জন্য এমনকি দূরে থাকা আত্মীয়স্বজনদের পুকুর ইজারা নিয়ে বা যৌথভাবে মাছ, হাঁস, ডিম উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এর পাশাপাশি গাভি পালন, দুধ উৎপাদন, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পালন ও মোটাতাজাকরণ, তাঁত ও কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। এসব

ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ারও সুযোগ আছে।

বিপণন ব্যবস্থা

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সবাই এসব কাজে হাত দিলে ফসল, ফল, সবজি, মাছ মুরগির উৎপাদন তো চাহিদার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে তখন? তখন তো এর দাম পাওয়া যাবে না বা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগীরা তাদের পণ্য পরিবহনে করে কাছাকাছি বড় ধরনের বাজারে পাঠাতে পারেন যাতে করে বেশি দাম পাওয়া যায়। উদ্যোক্তারা ব্যাংকের কাছ থেকে কিস্তির মাধ্যমে মিনি ট্রাক বা হাফ ট্রাক কিনে নিতে পারেন। এতে করে নিজেদের পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি অন্যের পণ্য পরিবহন করে বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন তারা।

এই পুরো উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে কোন জায়গায় অন্যায় বাধা, ঘুষ, চাঁদাবাজি, হুমকি বা হয়রানির শিকার হলে তা পুলিশ এবং গণমাধ্যমের নজরে আনতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবসা

গবেষকদের পূর্বাভাস অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী তৈরির কাজ বেশ লাভজনক বলে এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, করোনাভাইরাস মহামারির এসময়ে দেশে-বিদেশে মাস্ক, গ্লাভস, পিপিইর মতো নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং থাকবে। খোঁজ-খবর নিয়ে কুটিরশিল্প আকারে যথাসম্ভব নিজেরা এগুলোর উৎপাদনে যেতে হবে। অনেকে সেলাই মেশিন কিনে ঘরে বসে মাস্ক তৈরি ও সরবরাহ করছে বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্ভব হলে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যস্থতার ব্যবসায় নামতে হবে। উৎপাদকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী কিনে তা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজও শুরু করা যেতে পারে। শুরু হতে পারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ।

অনলাইনে খাবার বিক্রি

করোনাভাইরাস মহামারির এ সময়ে তৈরি খাবার বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। গৃহকর্মীরা ছুটিতে থাকতে বাধ্য হওয়ায় এমনকি আটার বা চালের রুটিও অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। রাজধানী, বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা বড় ব্যবসা হয়ে উঠছে। উদ্যোক্তারা ক্রেতার রুচি অনুযায়ী খাবার সরবরাহও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ডাল-ভাত ডট কম, গোস্ত-রুটি ডটকম বা পিঠাঘর ডটকম নামের সাইট খুলে তা অনলাইনে বা শহরের বিভিন্ন জায়গায় সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সবাইকে জানান দিতে হবে। স্থানীয় ডিশ লাইনে বিজ্ঞাপন, লিফলেট, ভিজিটিং কার্ড ধরনের প্রচারপত্র বিলি করেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রচারে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

অনলাইনে কাপড় বা কাঁথা বিক্রি

মহামারিকালীন এসময়ে মার্কেটমুখী মানুষের সংখ্যা কমেছে ব্যাপকভাবে। তাই অনলাইনে কাপড়চোপড় বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণে। নানা ডিজাইনের কাপড়চোপড় ঘরে বসেই বানাতে পারেন অনেকে। আর সে তৈরি পোশাকের কথা অনলাইনে জানান দিতে পারেন তারা। খুলতে পারেন ওয়েবসাইট। স্থানীয় ডিশ লাইনে বিজ্ঞাপন, লিফলেট, ভিজিটিং কার্ড ধরনের প্রচারপত্র বিলি করা যেতে পারে। জেলা শহরের উদ্যোক্তারা নিজ শহরের পাশাপাশি বিভাগীয় শহরগুলো বা রাজধানীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারেন।

কাঁথা বিক্রিরও ধুম চলছে। কাঁথা বা নকশি কাঁথা বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। উদ্যোক্তারা নিজেরা কাঁথা তৈরি করে বা সংগ্রহ করে স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করা বা রপ্তানির সুযোগ নিতে পারেন।

কুরিয়ার সার্ভিস গড়ে তোলা

করোনা ভাইরাসকালে জমজমাট ব্যবসা করছে কুরিয়ার সার্ভিসগুলো। অনলাইনে পণ্য সামগ্রীর অর্ডারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কদর বেড়েছে কুরিয়ার সার্ভিসের। এ সময়ে বেকারের সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় তাদের নিয়ে নিজস্ব কুরিয়ার সার্ভিস চালু করা সম্ভব। কুরিয়ার সার্ভিস চালু করার আগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে এর কাজকর্মের ধরনসহ বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

আউট সোর্সিং

শিক্ষিত জনশক্তির জন্য আউট সোর্সিং আয়ের বড় উৎস হতে পারে। আগ্রহীদের একত্রিত করে স্বল্পতম সময়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে এ প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের এক্সেস টু ইনফরমেশন-এটুআই, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনজিওর সহায়তা নিতে পারেন উদ্যোক্তারা। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে উদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে কর্মরতদের সহায়তা নিতে পারেন। প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পারসন হিসাবে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে পারেন যিনি ফিভার বা আপওয়ার্ক-এর মতো আউট সোর্সিং প্রতিষ্ঠানে কাজ ধরিয়ে দিতে পারেন। জানাশোনাদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা যেতে পারে। যেসব আউট সোর্সিং কমিউনিটি রয়েছে তাদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ খাতের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার আয় করা সম্ভব।

এছাড়া, উদ্যোক্তারা আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উপযোগী বা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কলকারখানা স্থাপন করে নিজেদের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করায় অবদান রাখতে পারেন তারা।

জাতিসংঘের হিসাব মতে, বিশ্বের ৮০০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবন চালিয়ে থাকেন। উন্নত দেশ কানাডা, জাপান ও নরওয়েতে প্রতি তিনজনে একজন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে প্রতি চারজনে একজন সমবায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন। জাপানে কৃষিকাজে নিয়োজিতদের ৯০ শতাংশই সমবায়ী।

মহামারিকাল বা দুর্যোগব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টিতে সমবায়ী বা যৌথ উদ্যোগ সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। আর এসব উদ্যোগ কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এসব উদ্যোগ একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে অনন্য উচ্চতায়।

আবু তাহির মুস্তাকিম : সাংবাদিক

পতিত জমিতে খাদ্য উৎপাদনে বঙ্গবন্ধুর ডাক

ডঃ কিউ আর ইসলাম

নতুন, স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে কৃষকেরাও লড়েছে। বাধাগ্রস্ত হয়েছে খাদ্য উৎপাদন। সাড়ে সাত কোটির উপর জনসংখ্যা। দেশের মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু আদর্শ সবুজ বিপ্লবের ঘোষণা দেন। এদিকে ১৯৭৪ সালের বন্যায় ধান উৎপাদন আগের বছরের থেকে ৬ লাখ টনের উপর কমে যায়। ওই সময় অর্ধেকের বেশি ধান উৎপাদন হতো আমন বা বর্ষা মৌসুমে। বর্তমানে বোরো বা শুষ্ক মৌসুমে সেচাধীন জমিতে বেশিরভাগ ধান উৎপাদিত হয়ে থাকে। খাদ্য ঘাটতি পূরণে সরকারি পর্যায়ে সকল প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু দেশের সকল পতিত জমি চাষের আহ্বান জানালেন। সারা দেশে তখন মোট আবাদি জমির এক-দশমাংশের উপর পতিত ছিল। অপরদিকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে সারা বছরে মাত্র একটি ফসল আবাদ হতো। উন্নত প্রযুক্তির অভাব ছিল। নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। দশ শতাংশের মতো জমি ছিল সেচের আওতায়। উন্নত জাতের বীজ, সার, সেচ সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ দ্রুত কৃষকের দোরগোড়ায় পাঠাবার জন্য উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের অভাব ছিল। স্থানীয় খাদ্য ঘাটতি মিটাতে পতিত জমি আবাদ করে ব্যাপকভাবে ধানের আবাদই ছিল সবচেয়ে কার্যকর একটা উপায়। দেশের এই কঠিন সময়ে কয়েকজন সহপাঠী একত্রিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কিছু একটা করে খাদ্য উৎপাদনে অংশীদার হতে অধীর হয়ে পড়লাম। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সবাই ঝাপিয়ে পড়েছিল। আমরা তখন শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের ছাত্র। অনতিদূরে গণভবন। প্রধানমন্ত্রীর নতুন কার্যালয়। মাস ছয়েক আগে ইনস্টিটিউটের ছাত্র পরিষদের নির্বাচনে জয়ীদের সাথে সুগন্ধায় বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ হয়। বারান্দায় এসে তিনি আমার মাথায় ঝাঁকড়া চুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কিরে লেখাপড়া করিসতো"?

সিদ্ধান্ত হলো পতিত জমিতে ধান আবাদ করব। দ্বিতীয় বর্ষে আমাদের পাঠ্যক্রমে ধান উৎপাদন প্রযুক্তির উপর আমাদের প্লট এক্সপেরিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপলব্ধি করলাম যে পতিত জমিতে নতুন প্রযুক্তিতে ধান আবাদের সাথে দেশে খাদ্য উৎপাদনে অংশীদার হতে পারব। শেরে বাংলা নগর কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন প্রায় এক একরের কাছাকাছি পতিত জমি পাওয়া গেল। জমিতে ধান চাষে কমিউনিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষ অনুমতিও দিল। শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র যন্ত্রপাতি ওয়ার্কশপ ছিল। এই ওয়ার্কশপের কর্মকর্তাদের পরামর্শক্রমে যোগাযোগ হলো বিএডিসি'র গ্রিন রোডের অফিসে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার হাওলাদার সাহেবের সাথে। তিনি আমাদের পরিকল্পনা ও উৎসাহ দেখে সকল সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। দুদিন পরেই বরাদ্দ পাওয়া গেল একটি ম্যাসি ফার্গাসন ট্রাক্টর। নিজেরাই ট্রাক চালিয়ে শুরু করলাম জমি চাষ। মাটির সোদা গন্ধে ভরে গেল মন। এদিকে এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আরো কয়েকজন এগিয়ে এলো। প্রতিষ্ঠিত হলো একটি সমবায় সমিতি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে সমিতির নামকরণ করা হলো। শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়ের পিছনে পতিত জমি সহ সমিতির আওতায় ধান আবাদে মোট এলাকার পরিমাণ দাঁড়ালো ছয় একরে। সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে সমান হারে অর্থ আদায় করে একটি তহবিল গঠন করা হলো। বিএডিসি থেকে সংগৃহীত হলো আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের বীজ। বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের এক্সপেরিমেন্ট প্লটে বীজতলা তৈরি করা হলো। অ্যাগ্রোনমি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক দবির স্যার আমাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করলেন। বিএডিসি থেকে ক্রয় করা হলো সার। পাওয়া গেল সেচ পাম্প। আগারগাঁও থেকে শ্যামলি যেতে রাস্তার ডান পাশের খাল থেকে পানি সেচে জমি তৈরি হলো। ইতোমধ্যে আমাদের এই উদ্যোগ অনেকের নজরে এলো। রেডিও বাংলাদেশের ফার্ম ব্রডকাস্টিং এর সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক আমাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য যন্ত্রপাতি সহ কয়েকজনকে পাঠালেন। পরেরদিন প্রচারিত হলো আমাদের উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ। চারা রোপণ শুরুর দিনে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুস সামাদ এসে আমাদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। আমাদের অন্তরে তখন বিজয়ের আবেগ। প্রতিদিন ভোরে ক্লাসে যাওয়ার আগে এবং বিকালে জমিতে ফসল পরিচর্যার কাজ করতাম। গভীর রাতে জমিতে সেচপানি ঠিকমতো পৌঁছালো কি না পরীক্ষা করেছি। সারের কার্যকারিতা, গাছের বর্ধন ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেছি। ছুটির দিনে উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করেছি। পরিপক্ক হলে ধান কেটেছি। মাড়াই করেছি। প্রথম আবাদে তিনশ মণের কাছাকাছি ধান উৎপাদন হয়েছিল। আমাদের দেখাদেখি আগারগাঁও সরকারি কোয়ার্টারের বাসিন্দা এবং পরিকল্পনা কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা গিয়াসউদ্দিন সাহেব, পিডব্লিউডি'র কর্মচারী লালু ভাই এবং কৃষি ইনস্টিটিউটের আরো কয়েকজন ছাত্র পতিত জমি চাষ করেছিল। আমাদেও পরামর্শও নিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আর একটি ডাকে আমরা সাড়া দিতে পেরে আর এক বিজয়ের স্বাদ পেয়েছিলাম। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সারা দেশেই পতিত জমির চাষে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। উল্লেখ্য, পরের বছর ধান আবাদি জমি সারাদেশে সাড়ে পাঁচ শতাংশের উপর বৃদ্ধি পায়। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল তের শতাংশের উপর। দেশের প্রধান খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে পতিত জমি চাষের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইতোমধ্যে পতিত জমি কমে গিয়ে ধান আবাদি জমি প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণের উপর। বাংলাদেশে এখন আর খাদ্যের অভাব নেই। খাদ্যে আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অগ্রগতির পেছনে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশাল এবং অপরিসীম।

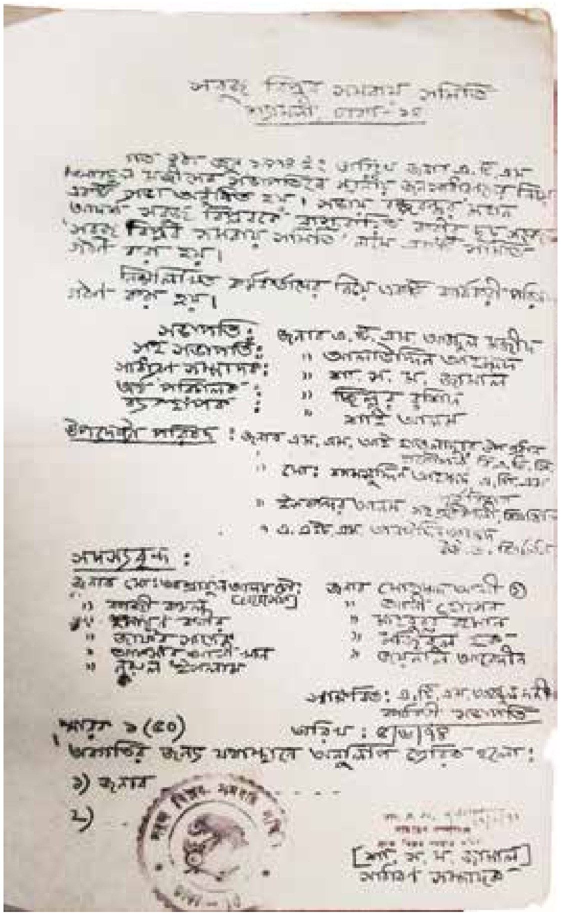

পুনশ্চ: সবুজ বিপ্লবসমবায় সমিতির সদস্যদেও বেশিরভাগ সরকারি চাকরি শেষে অবসর নিয়েছে। তিনজন অন্যদেশে নাগরিকত্ব নিয়েছেন। কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছেন।

লেখক : ডঃ কাজী রেজাউল ইসলাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল এক্সটেনশন রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সার্ডি) তে একাধীক পদে চাকরি করেছেন। পরবতীতে সিডা, এডিবি, এফএও, ইফাদ, জাইকা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহ-অর্থায়নে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পে কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। অংশগ্রহণ মূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স এর সদস্য ছিলেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক জার্নালে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের প্রেস এন্ড পাব্লিকেশন সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাপানে কিউস্যু ইউনিভার্সিটিতে ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। বর্তমানে কনসলট্যান্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

হরিদাস ঠাকুর

নারী ও সমবায় শক্তির প্রতীক-উন্নয়নের প্রতীক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এখনো পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা মানুষের মূল অংশটি হচ্ছে নারী। এটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য। মূলত সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। সেজন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয় রে আয়/দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়।' বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মহিলা সমবায় সমিতি আছে দেশে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে আসছে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। আসলে ব্যাংকিং, কৃষি, মাছ চাষ, মৃত্তিকা শিল্প, কুটিরশিল্প, তাঁত শিল্প, প্রতিটি সেক্টরের মূলে ছিল সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগ। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায় বিভাগের দৃষ্টির আড়ালে এসব অর্জন ও সাফল্য এখনো অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি মুজিববর্ষে 'নারীর ক্ষমতায়ন : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে এবং সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টির স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

নিকট অতীতে নারীর অবস্থা ছিল বন্দিনীর সমতুল্য। 'অসূর্যস্পৃশ্যা' নারী ছিল পুণ্যবতীর প্রতীক যার জন্য চারদেয়ালে বাঁধা সংসার নামক অচলায়তন ছিল তার সবখানি পৃথিবী। রান্নাবান্না আর পুরুষের সেবা করাই ছিল তার কাজের সিলেবাস। মুক্ত পৃথিবী ছিল শুধু পুরুষের কর্মক্ষেত্র। বেগম রোকেয়ার রচনাবলীতে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' নামক কবিতাতেও বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে যার একটা অংশ নিম্নরূপ :

বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা-
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

কিন্তু সব নারী এই বন্দিদশা মন থেকে মেনে নেননি। তারা মুক্তির জন্য ছটফট করেছেন। চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুক্তির দিশা পাননি। পথ পাননি অচলায়তন ভেঙে বাইরে আসার। বিধাতারে কাছে সঙ্গোপনে ফরিয়াদ জানিয়েছেন আর অভিশাপ দিয়েছেন নারী হয়ে জন্মানোর নিয়তিকে। তারপরও সেই অবস্থার মধ্য থেকেই দু'চারজন নারী সাহসী হয়ে উঠেছেন নারীর মুক্তির পক্ষে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের জানান দেয়, নারীরা আজ সমাজ ও সংসারে উন্নয়নের পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারী তার স্বাধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার?
হে বিধাতা -
যাব না বাসর ঘরে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

এই দৃঢ়চেতা নারীর আপন ভাগ্য জয় করার ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ে সমবায় শক্তি জোগায়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা 'নারী' কবিতায় সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, নারী জাগরণের কবি কাজী নজরুলের নারী পুরুষ সম্পর্কিত অমিততেজী ভাষ্য উচ্চারণ করতে পারি :

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না;
হাতে রুলি, পায় মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!
সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

সমবায়কে পাথেয় করে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'রাই আজ অসাধারণ হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ প্রগতির পথে-জীবনের রথে। আর তাইতো গৌরী প্রসন্ন মজুমদারে কথায় ঘরবন্দি নারীদের যে চিত্রকল্প পাই তা আজ নির্বাচিত হতে চলেছে 'নারীর ক্ষমতায়নের হাত ধরে'।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার,
এই তোমাদের পৃথিবী
এর বাইরে জগত আছে তোমরা মাননা।
তোমাদের কোনোটা হাসি কোনোটা ব্যথা,
কোনোটা প্রলাপ কোনোটা কথা,
তোমরা নিজেই জাননা।
এর বাইরে জগত আছে তোমরা মানোনা
তোমরা নিজেই জাননা।
খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী।

আমরা জানি আমাদের এই বাংলা ভূখণ্ডে নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার হাত ধরেই বাংলার অবহেলিত বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীরা জাগরণের পথে এসেছে-স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। রোকেয়ার যুগে নারীরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী-অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্যস্পর্শা। এই অবস্থায় বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রথম নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী এবং অনন্যসাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এঁকেছিলেন এভাবে : **তোমাদের কন্যা শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও দেখিবে তারা নিজেদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া নিতে পারিবে।**

আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। নারী অবলা- তারা কঠিন কাজ করতে পারে না। বিশাল চাপ সামলাতে পারে না। অথচ যেকোনো কঠিন কাজ নারী অবলীলায় করতে পারে। তারা ঘর সামলান দক্ষতার সাথে-তারা অফিস সামলান যোগ্যতার সাথে- তারা দুর্গম পথ পাড়ি দেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের দৃপ্ত পদচারণা। উদাহরণ দিলে আমরা নারীর প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবো।

ক. বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে আমরা জানি, একজন মানুষ একবারে ৪৫ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে। একজন নারী/মা যখন একটি শিশুকে জন্মদান করেন, তখন তিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যথা সহ্য করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙে যাওয়ার থেকেও বেশি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন নারী কত কষ্টসহিষ্ণু, নিবেদিতপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কাজে কত সংগ্রামী। (তথ্য : ফেসবুক থেকে)।

খ. গবেষণা তথ্যানুযায়ী, একজন নারী দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা কাটায় পরিবারের বিভিন্ন কাজের জন্য।

গ. একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ৪৫ ধরনের গৃহস্থালির কাজ করেন এবং বিপরীতে একজন পুরুষ করেন মাত্র ২২ ধরনের কাজ। গবেষণা বলছে ৪৫ রকমের গৃহস্থালির কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে করাতে গেলে প্রতিমাসে ১০ থেক ২০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজের বার্ষিক অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার কোটি ডলার। (৭৫,৬৮৪ কোটি থেকে ১, ৬৮,০০০ কোটি টাকা)।

নারীকে তাই কোনোভাবেই অবহেলা বা হেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই শারীরিক-মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে।

উপরের বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে

‘বাঁচতে শেখা’ এনজিও প্রকাশিত একটি চমৎকার পোস্টারের মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ প্রতিষ্ঠিত ‘বাঁচতে শেখা’ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। তাদের পোস্টারটি নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে :

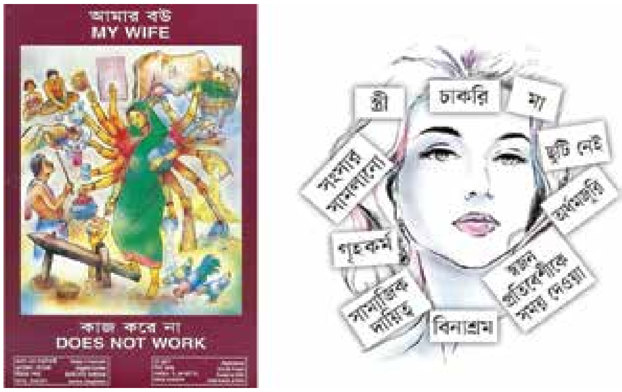

নারীর বহুমাত্রিক কাজের পোস্টার

‘নারীকে তার প্রাপ্য দিলে-দেশ ও দশের সুফল মিলে’-নারী দিবসের এ স্লোগান শুধু কথার কথা নয়, একটি জীবনধর্মী ও উন্নয়নকামী আপ্তবাক্য। একটি গতিশীল ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে নারীর প্রতি আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা সমবায়ের মাধ্যমে কর্ম স্রোতে এনে আমাদের মা-বোন-কন্যা-জায়া হিসেবে নারীর অবস্থানকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে WOMAN শব্দটির অর্থ হবে-

W	Workforce and Wealth কর্মশক্তিতে সম্পদ
O	Organized and Operating সংগঠিত কার্যক্রম
M	Motivation and Manager চেতনাগত দক্ষ ব্যবস্থাপক
A	Active and Accountable দায়বদ্ধতায় সক্রিয়
N	Nice and New Horizon নবদিগন্তের চেতনাদীপ্ত কর্মী

উপরিউক্ত আলোচনার সারাংশে আমরা বলতে পারি, সমবায় নারীকে জাগ্রত করে তাকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়- ‘সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন’। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদি সংজ্ঞা মতে, ‘সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা।’ সমবায়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে COOPERATIVE. COOPERATIVE শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘COOPERARI’ থেকে। এখানে ‘পড়’ এর অর্থ ‘সাথে’ (‘with’) এবং ‘operari’ শব্দের অর্থ ‘কাজ করা’ (‘to work’)। সুতরাং ‘COOPERARI’ শব্দের অর্থ দাড়ায় একসাথে কাজ করা। (“working together.”)।

ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের (‘আমরা’) সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ ‘আমি’ শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই ‘আমরা’ শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই ‘সমবায়’ নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত। সমবায় ‘আমি’ কে ‘আমরা’য় পরিণত করে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে বলা যায়, ‘আমি’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘ও’ অপর দিকে ‘আমরা’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘We’। ‘আমি এর চেয়ে ‘আমরা’ অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ আমি ‘একক ব্যক্তি’ কিন্তু আমরা হচ্ছে ‘ব্যক্তির সমষ্টি’। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা জানি,‘আমিত্ব’ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মে। কারণ ‘আমি’ থেকে ‘আমরা’য় পরিণত হলে কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : Illness মানে অসুস্থতা। কিন্তু এই Illness শব্দের I কে (আমি) We (আমরা) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে হয়ে যায় Wellness যার অর্থ সুস্থতা। এভাবেই সমবায় সমাজে একক ব্যক্তিকে সমষ্টিতে পরিণত করে সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়ের মৌল চেতনা। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায় এ আদর্শেই কাজ করে।

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন : আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। অপরদিকে ২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন : সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আলোকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সমবায়ের ভূমিকা ও কার্যকারিতার বিষয়ে বলতে পারি :

- সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর ।
- সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে ।
- সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।
- সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।
- সমবায় সমিতি পরোপকার শেখায় নিজের প্রয়োজনে মিটাতে উদ্বুদ্ধ করে।
- সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম
- পরিচালনা একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
- সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে। সমতাভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে ।
- সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরি করে।
- সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
- সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে ।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক।
- অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করে।
- সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
- মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়।
- মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেসব হলো-

১. নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি : সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা

বিনিয়োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে। সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

৩. গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরি: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে। সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি করে। সমিতির মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করে।

৪. সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫. অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বিষয়ক বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩৩ অনুচ্ছেদে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে: Livelihood development for disadvantaged women reducing vulnerability of women through building awareness through skill development and employment generation among the disadvantaged women living in south- west area of the country; increasing income of the targeted people; forming capital through savings will pursued.

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDG) এর ৫ নং অভীষ্টে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আমরা বিশ্বনেতাদের অঙ্গীকার পাই এভাবে:

> **Women**-Achieve gender equality and empower all women and girls
> জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে:

১. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;
২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)
৩. Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co- operatives.
৪. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
৫. সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।
৬. 'আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট'।
৭. বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
৮. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প"। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাক্কলিত টাকা ১৫১.৫৭০৩ কোটি। মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১। উপকারভোগী ১০,০০০ জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা/গাভি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এই প্রকল্পভুক্ত ১৩,৯৬৮টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা দরে দুধ কিনে নেয় মিল্ক ভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী

করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

সরকার ও সমবায় বিভাগের নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বেশকিছু মহিলা সমিতি ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সফলতার শীর্ষে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে নারীরা সমবায়ে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংসার ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রায়োগিকতাকে তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ রকম সফল মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা গোলাপ বানুর নাম উল্লেখ করতে পারি। এদম প্রান্তিক অবস্থা থেকে তিনি আজ নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও জয়িতা।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে '**নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা**' শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির উদ্যোগে। এ গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে নির্ধারিত মানদ- অনুসরণ করা হয়েছিল। এসব মানদণ্ডকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

ক. অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত :

১) আয় বৃদ্ধি হয়েছে কি না?
২) মর্যাদা বেড়েছে কি না?
৩) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৪) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না?
৫) পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
৬) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৭) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৮) কর্মসংস্থান হয়েছে কি না?
৯) আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
১০) নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?

খ. পারিবারিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিত :

১) পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার কতটুকু?
২) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?
৩) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?
৪) চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
৫) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?

গ. স্বাস্থ্য পরিপ্রেক্ষিত :

১) নিজের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
২) সন্তানের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

এ গবেষণায় বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিংস/ফলাফল পাওয়া গেছে। এসব উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ/ফলাফল হলো :

১) সমিতির সদস্য মহিলাগণ মূলত ৬টি পেশায় জড়িত। তাদের মধ্যে গৃহিণীরা (৬০%) স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব। চাকরিজীবী ১৫%; ব্যবসায়ী ১৩%; কুটিরশিল্প ৪%; এবং টেইলারিং ২% । বিবাহিত মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি।
২) মহিলাদের সাধারণ সদস্য ৬১%। সভাপতি হয়েছেন ৭%, সম্পাদক ৯%, নির্বাহী কমিটির সদস্য ১৩%; সহসভাপতি ৫% এবং কোষাধ্যক্ষ ৫%।
৩) গবেষণায় দেখা গেছে মহিলারা গড়ে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০ টাকার শেয়ারের মালিক। গড় শেয়ার মূল্য ৬৬২৮ টাকা।
৪) সমিতিগুলোর ৯৬% ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং ৯৯% সদস্য নিজেদের সম্মানিত হওয়ার বোধ অর্জন করেছেন।
৫) পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভে সমবায় সমিতি তাদের সহায়তা করছে বলে অধিকাংশ নারী মনে করেন।
৬) সমিতির ৯৯% মহিলা সদস্য মনে করেন যে সংসারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে।
৭) জরিপকৃত ১০৭ টি মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ৪৫ টি সমিতি থেকে মহিলারা স্থানীয়/জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারী নারীদের ৫৮% নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।
৮) ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে সমিতিতে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যজ্ঞান বেড়েছে। ডাক্তার/ ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতা বেড়েছে।
৯) ৯৭% উত্তরদাতা নারী মনে করেন যে, সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ায় তাদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে।
১০) অংশগ্রহণকারী ৯৯% নারী করনে যে সংসারে তারা আর অবহেলিত নন।
১১) নারী সমবায়ী যাদের ভবিষ্যতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে জড়িত হতে চান, তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যেসবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৮%) ব্যবসা করতে আগ্রহী। ২৭% চান হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার; ১০% সেলাই কাজ; গাভিপালন ও দুগ্ধখামার চান ৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমবায়দের চিন্তাচেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এতদিন যাবৎ যেসব কাজ "শুধুই পুরুষের কাজ" বলে গণ্য করা হতো, সমবায়ী নারীরা সেসব কাজে বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।
১২) বিবাহিত মহিলাগণ আর্থসামাজিকভাবে স্বনির্ভর ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশি আকাঙ্ক্ষী।

গবেষণার আলোকে বেশকিছু সুপারিশ ও মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো হলো :

১) সমবায় বিভাগের নারীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে সফল করার বিষয়ে ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করে আরও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে।
২) নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট দিলে তাদের সফলতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
৩) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নারী সমবায়ী তথা সমবায়ীদের সঙ্গে সংযোগ আরও বাড়াতে ও নিবিড় করতে হবে।
৪) মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন।
৫) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭) মহিলা সমবায়ীদের উচ্চমূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ (Training with High Value Addition) প্রদান করে যথাযথ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা (Marketing System with Proper Linkage) এর প্রসারণ ঘটাতে হবে।

সমবায় নারীর ক্ষমতায়নে কীভাবে কাজ করে-এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছিল 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গবেষণায়। প্রাপ্ত ফলাফলকে আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে পারি নিম্নোক্তভাবে :

বাংলাদেশের নারীদের জীবনে মোটাদাগে ৪টি 'NOT' আছে । এই ৪টি 'NOT' তাদের জীবনের আর্থসামাজিক সক্ষমহীনতার পরিচায়ক। সমবায় তাঁর আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের

জীবন থেকে এই ৪টি 'NOT'তুলে দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। আমরা সাধারণ একজন নারীর জীবন উপলব্ধি থেকে এই ৪টি 'NOT'এর দ্যোতনা বুঝতে পারি এভাবে :

ক.
সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে নারীর জীবনের সেকালের হতাশাজনক গল্প

I have NOT kept my PROMISES to my family and friends. I Can NOT PROVIDE for all their needs. I do NOT PLAN ahead for time and my future is NOT ASSAUED.
(Life with 4 NOTs)
[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি না। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি না। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি না এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না।]
(চারটি না যুক্ত জীবন)

খ.
সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের একালের উদ্দীপনাময় গল্প

I have kept my PROMISES to my family and friends. I Can PROVIDE for all their needs. I do PLAN ahead for time and my future is ASSAUED.
(Life without 4 NOTs)
[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ।]
(চারটি না মুক্ত জীবন)

গ.
সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের আত্মবিশ্বাসী উপলব্ধি

Proper Planning and Income Generating Activities (IGA) today holds the Key to a Better Future.
[আজকের সঠিক পরিকল্পনা এবং আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে।]

ঘ.
সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর আত্মবিশ্বাসী গর্বিত উচ্চারণ

I was bad- I became Better- Better is now the Best.
[আমরা খারাপ ছিলাম-ভাল হয়েছি- বর্তমানে সর্বোচ্চ ভাল অবস্থায় আছি।]

ঙ.
সমবায়সম্পৃক্ত আত্মবিশ্বাসী নারীর জীবনে 'NOT'এর ইতিবাচক অর্থ

NOT means Next Opportunities Tomorrow

সমবায়ের মাধ্যমে একজন অসহায় ও উন্নয়নবিহীন নারীর জীবনের ৪টি 'NOT' কেটে যাওয়ার বাস্তব উদাহরণ মিসেস গোলাপ বানুর সমবায় অভিযাত্রার কাহিনী। মিসেস গোলাপ বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ', ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [সমিতির নিবন্ধন নম্বর : ২১৯/৯৬, ঠিকানা : ১১৬০, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২]। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরিব মানুষের ২৪ ঘণ্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরিব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/ উন্নতি করার অবলম্বন

বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মতো। কিন্তু সমবায় গরিব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় আপনার এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। সমিতির সফলতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নরূপ :

১) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান মোট সদস্য ১,৩৫,০০০ জন (সমিতির মূল সদস্য : ৬০,০০০ জন এবং ক্ষুদে বা সহযোগী সদস্য ৭৫,০০০ জন)।
২) ১,৩৫,০০০ জন মহিলা/মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে একটি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে।
৩) সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন : ৪৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৫০ কোটি টাকাই সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কল্পে বিনিয়োজিত আছে। সমিতিতে ১২ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান।
৪) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সমিতিতে বর্তমানে ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি কর্মে নিয়োজিত আছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।
৫) সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৩, ২০১১, ২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে।
৬) ২০১১ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরামে ইন্টান্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছেন।
৭) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছেন।
৮) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন।

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা একটি বিরাট অর্জন বলেই ধরে নেওয়া যায় এবং কবি কাজী নজরুলের উদাত্ত আহ্বানকেই জাগ্রত করে :

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা ॥

নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধাগুলো হচ্ছে পুরুষতন্ত্র প্রযোজিত ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা, সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ক আইনকানুন ও বিধিবিধান, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং নানাবিধ প্রথা এবং এসব বিষয়ে নারীদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা। এমনকি উচ্চশিক্ষিত নারীরাও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় আজও সচেতন নন। নারী তার নিজের নামটাও নিজের করে ধরে রাখতে পারেন না। তার নামের অংশ হয়ে থাকে পুরুষতান্ত্রিক পদবী। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। একসময়ের মার্কিন ফার্স্ট লেডি ছিলেন হিলারী রডহাম ক্লিন্টন। তার জন্মগত ও সার্টিফিকেটের নাম হিলারী রডহাম। রডহাম তার পিতার নামের অংশ। বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে বিয়ে হলে সেখানে আরেকটি পুরুষ নাম যোগ হয়ে হয়েছে হিলারী রডহাম ক্লিন্টন। এটা নারীর উপর পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দওয়া প্রথা। তেমনি নারীকে হতে হবে স্লিম, ক্ষীণতনু যাতে পুরুষ বলনৃত্যের সময় তাকে ইচ্ছেমতো একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে, শূন্যে তুলে ঘোরাতে পারে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটির মাঝেও পুরুষের আধিপত্য ও নারীর ভোগ্যপণ্য হয়ে থাকার ইঙ্গিত আছে। বলিউডের সালমান খান আর কারিনা কাপুর খান-দের শারীরিক রূপ ও সামর্থ্য দেখলেও পুরুষতন্ত্রের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে নারীকে বের হয়ে আসার আহ্বান আজকালকার দু'একজন কবির কবিতাতেও দেখতে পাওয়া যায় যা আমাদের আশান্বিত করে :

সোনাভান- ইন্টারনাল অডিটের চোখে একবার, অন্ততঃ
একবার নিজের আয়নায় নিজেকে নিয়ে দেখো-
এভাবে আর কতদিন তুমি অন্যের দিন যাপন করবে?
এভাবে আর কতদিন তুমি যাপন করবে অন্যের রাত?

ইতিহাস অথবা কিংবদন্তী, পুঁথি অথবা পুরাণ- যা-ই হোক-
আমাদের বিশ্বাসের পায়ে ভর দিয়ে
তুমি কঠিন সত্যে ফিরে এসো টুঙ্গি শহরের সোনাভান
ক্যাটওয়াকের বিড়ালিনী নয়, বলনৃত্যের শংসিত পুতুল নয়
তোমার পদাঘাতে কেঁপে ওঠুক মতলববাজের রঙিন মঞ্চ।

সোনাভান, তুমি কেন আর শুধুই অন্যের ব্রতের সহায় হয়ে থাকবে?
এবার ঠিক করে নাও তোমার নিজের ব্রত নিজের গন্তব্য
সিদ্ধান্ত এই হোক-আর নয় তোমার নামের শেষে অন্যের নামের
উপনিবেশ; এবং কারো আর অর্ধাংশ হয়ে থাকাও নয় তোমার।
(সোনাভান/ আমিনুল ইসলাম)

নারীদেরই নারীর ক্ষমতাহীনতার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। বাস্তবে যার হাতে ঐশ্বর্য ও অর্থনীতি এবং নেতৃত্ব, তার হাতেই সকল ক্ষমতা। যুগ যুগ ধরে পুরুষজাতি তাদের দখলে রেখে এসেছে ঐশ্বর্য, অর্থনীতি ও নেতৃত্ব। সমবায় নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে, ঘরের বাইরে এসে আয়-উপার্জনমূলক কাজ করতে এবং সর্বোপরি নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নারীদের অব্যর্থভাবে পথ দেখায়, সহযোগিতা প্রদান করে। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় ২৭,৪৪৮টি মহিলা সমবায় সমিতি আছে। দেশের ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন সমবায়ীর মধ্যে ২৬,৪৯,৮০৩ জন মহিলা, যা মোট সদস্যের প্রায় ২৩%। অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলোতেও নারীর সদস্য রয়েছেন। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। নারী যেসবকিছুতেই পুরুষের সমকক্ষ এবং সে পুরুষের অধীন হওয়ার জন্য তার জন্ম নয়, পুরুষের ভোগের সামগ্রী বা খেলার পুতুল হওয়া তার কাজ নয়, এসব বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের কাজও লোকচক্ষুর অন্তরালে করে যাচ্ছে সমবায় সমিতিগুলো। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঘরে ঘরে অসংখ্য গোলাপ বানু গড়ে উঠবেন, এমনটাই আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

হরিদাস ঠাকুর : অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস এর উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনা ও কো-অপারেটিভ মডেল ভিলেজ

মোঃ আবুল খায়ের

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একই উদ্দেশ্যে সমষ্টিগতভাবে কোন একটি কাজ করাই সমবায়। সমবায় হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি সংগঠন। পিছিয়ে থাকা সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কোন কাজ একা একা করে নিজের ও সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।কিন্তু দশ/কুড়ি জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। আর সেজন্যই বলা হয় ‘দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ’।

এই উপমহাদেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে। সমবায়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা হয় এ উপমহাদেশে চল্লিশের দশকে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পুর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে।যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো সেই সময়ের তরুন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তখন থেকেই মুলত গ্রাম অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য সমবায় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিলো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পুর্বে তিনি বলেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে, গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।’ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন।তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম

বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভবন

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদও ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে হবে।'' তিনি ১৯৭৩ সালে গ্রামের দুদ্ধ খামারিদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলার জন্য মিল্কভিটার মত বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যা আজও দেশের দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যাপক ভুমিকা পালন করে আসছে।কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে এদেশের সমবায় ভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে থামিয়ে দেয়।দীর্ঘ ২২ বছর পর জাতির পিতার কন্যা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে তার বাবার দেখানো পথে হেটে সমবায় কেন্দ্রিক নতুন করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ২০২০ উদযাপনকে স্বরণীয় করনের জন্য বর্তমান সরকার তার স্বপ্নের গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীন সম্পদের সুস্থু ও সুসম ব্যবহার নিশ্চিত করে গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষি যান্তিকিকরনের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদনে বৃদ্ধির সুযোগ রেখে বঙ্গবন্ধু কো-অপারেটিভ মডেল ভিলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দোগ গ্রহন করেছেন। সমবায় অধিদপ্তর ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের পাইলটিং করার জন্য ১০ টি ইউনিয়নকে চুরান্ত করে একটি ডিপিপি চুরান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রেরন করেছে ।সমবায় ভিত্তিক বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভিলেজ প্রকল্প এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামের নাগরিকগণ সহজে শহরের অনেক সুবিধা লাভ করতে পারবে।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে গ্রামের বর্তমান অর্থনৈতিকচিএ আমুল বদলে গিয়ে গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ যোগাযোগ অবকাঠামোর পরিবর্তন, জৈব জ্বালানীর ব্যবহার তৈরি, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারসহ শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামগুলো নগরের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে।এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দার হওয়ার পাশাপাশি কৃষি যান্তিকিকরনের মাধ্যমে অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সহজে নিশ্চিত করা যাবে।প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের সম্পদের সুসম ব্যবহার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রামের নানা পরিবর্তন সাধিত হবে।

প্রকল্পটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়ন করা হলেও এর সৃষ্ট সুবিধার ব্যাপ্তি সমগ্র ইউনিয়ন ব্যাপি হবে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ- কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রামের কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, মানবশ্রমকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পোষ্ট হারভেস্ট লোকসান কমানো, পানির সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সমগ্র ইউনিয়ন সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। প্রাথমিকভাবে প্রতি গ্রামে ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় (প্রতি গ্রামের জন্য)ট্রাক্টর - ১০০ একর জমি চাষের জন্য প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ২টি ট্রাক্টর সরবরাহ করা হবে।ট্রান্সপ্লান্টার- ১০০ একর জমি চাষের জন্য প্রতিটি সমবায়

এক নজরে বাংলাদেশের সমবায়

১. মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা : ১,৯০,৫৩৪ টি

২. ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা : ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন

৩. কার্যকরী মূলধন : ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা

৪. সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান : ৯,৩৭,৪৩৬ জন

৫. জাতীয় পযায়ে ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স, দেশের দুগ্ধশিল্প বিকাশে মিল্কভিটার মত সমবায় প্রতিষ্ঠান

৬. বিসিএস (সমবায়) কর্মকর্তা : ১৯২ জন

৭. সমবায় একাডেমি ১টি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন

৮. মোট জনবল : ৫,০০৪ জন

সমিতিতে ১টি ট্রান্সপ্লান্টার সরবরাহ করা হবে।হারভেস্টার- প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ১ টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার সরবরাহ করা হবে।সেচ ব্যবস্থা- পানির অপচয়রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য পাম্প চালনায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের কাঠামো স্থাপন করা হবে। ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাঠামো নির্মাণে বিএডিসি/ আরডিএ/ IDCOL এর সহায়তা গ্রহণ করা হবে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও মানসম্মত মাছ চাষের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের জন্য গ্রামে ২ টি প্রদর্শনী পুকুর তৈরি করা হবে। পশুপালন, ডেইরী ও পোলট্রি : সারা বছরের আয় নিশ্চিত করা, অফফার্ম কার্যক্রম হিসেবে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর গ্রামের মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে গ্রামে একটি প্রদর্শনী খামারে শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের জন্য একটি মধ্যম আকৃতির খামার তৈরি করা হবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৩ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

সমিতিকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কমিউনিটি ভবন নির্মাণ। গ্রামের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হবে সমিতির এই কমিউনিটি ভবন। ১ বিঘা ক্যাম্পাসের জমিতে প্রায় ৪৮০০ বর্গফুটের দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস, সভাকক্ষ, কম্পিউটার কেন্দ্র ও ডিজিটাল সেন্টার, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

নির্বাচিত গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম সমবায় গঠন করা হবে। এই সমবায় সমিতি পরিচালনায় একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং নির্বাচিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবেন।সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ও সমিতির সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পেশাদার মনোভাব সৃষ্টির জন্য ১০ টি সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করা হবে।

প্রজেক্টের আওতায় গঠিত সমবায় সমিতিসমুহ নিমোক্ত সুবিধা লাভ করবে

১. প্রতি সমিতিতে ২টি ট্রাক্টর, ১টি ট্রান্সপ্লান্টার, ১টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার সরবরাহ
২. প্রতিটি গ্রামে ২টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার এবং প্রতি গ্রামে ৪ টি উন্নত জাতের গাভি পালনের উত্তম চর্চার সংস্থান।
৩. ৪৮০০ বর্গফুটের কমিউনিটি ভবন নির্মাণ যেখানে হতে গ্রামের সকল নাগরিকগণ সরকারের বিভিন্ন সুযোগ গ্রহন করবে।
৪. দক্ষতা উন্নয়নে ৩২০ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন।
৫. ২০০০.০০ লক্ষ টাকার আবর্তক তহবিল।
৬. সরকারী সেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের সম্পৃক্ততায় বিভিন্ন বিষয়ে ২০০ টি উদ্বুদ্ধ করণ সভা আয়োজন।

এছাড়াও প্রকল্পের প্রায় ৩০ ভাগ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবে গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।যার ফলে গ্রামগুলোতে অনেক শিক্ষিত ও সচেতন মা তৈরি হবে যারা একটি শিক্ষিত দেশ উপহার দিবে।

প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে গ্রামের নিমোক্ত বিষয়গুলোর গুণগত পরিবর্তন আসবে;

১. ১০ টি মডেল গ্রাম সৃজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. গ্রামের প্রায় ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৩. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের আধুনিক ও উত্তম পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পুরন হবে।

৪. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ও পুনর্জাগরনের মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫. সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

৬. গ্রামীন দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভিলেজসহ বিভিন্ন প্রকল্প দেশের প্রতিটি গ্রামে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরকে নতুনরূপে ঢেলে সাজানো দরকার।সমবায় অধিদপ্তর দেশের সমবায় সমিতিসমুহের অডিট,নতুন সমবায় সমিতির নিবন্ধন ও পুরাতন সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল,মনিটরিং ইন্সপেকশন,নির্বাচনসহ নানাবিধ কাজ করে থাকে। এ সকল কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় এনে সঠিকভাবে সমবায় সমিতিগুলোকে মনিটরিং করা গেলে সমবায় সমিতিগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারবে ।

মোঃ আবুল খায়ের : উপ নিবন্ধক (ইপি), বিসিএস (সমবায়), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

শেখ হাসিনার সমবায় দর্শন : উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় একটি দেবোচিত চিন্তাধারা

মো. রফিকুল ইসলাম

বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ১৭৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পদ্ধতিগত 'সমবায়' এর সূচনা হয়। মূলত সম্মিলিত চেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র থেকে আর্থসামাজিক অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা থেকেই সমবায় সংগঠনের উৎপত্তি হয়। আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (International Cooperative Alliance ICA)-এর মতে, সমবায় হলো সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থসামাজিক অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় পরিচালনা করে। ২০১৬ সালে ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "সমবায় একটি দর্শন। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তির সমাজ গড়ে তোলা যায়।" (সূত্র : https ://albd.org/bn/articles/news)। ২০১৮ সালে ৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধনকালে তিনি একইভাবে বলেন, "সমবায় একটি দর্শন, এটি আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরীক্ষিত কৌশল। সমবায়-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈষম্য হ্রাস পায়, কারণ এটি সুসম ও টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়।" (সূত্র : ইউএনবি নিউজ, ২৫ নভেম্বর ২০১৮)। তাহলে গণমুখী অর্থনীতিতে সুসম ও টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও জননিরাপত্তা, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বোপরি দেশের তৃণমূল মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার জন্য অন্যতম সঠিক ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে সমবায় পদ্ধতি।

১৮৯৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ফ্রেডারিক নিকলসন। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের প্রদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সমবায় আইন ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করে। এই বাংলায় প্রথমবারের মতো 'জাতীয় সমবায়

নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয় ১৯৬২ সালে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মী নেতৃত্বের কারণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে 'স্বাধীন বাংলাদেশের' অভ্যুদয় ঘটে। এ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বঙ্গবন্ধু ক্লান্তিহীন দুর্বার গতিতে ছুটেছেন। বাঙালি কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে 'সমবায়'কে সম্পদের মালিকানার নীতিতে একটি পৃথক (২য়) খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা;)। অর্থাৎ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করেছিলেন। জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বলেছিলেন, "গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ...পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। ...পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।" (সূত্র : খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পা., বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, পৃ. ২০৪) একটি সমাজ বিপ্লবী গ্রাম সমবায় দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট শাহাদত বরণের মাত্র ২৫ দিন আগেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। ... আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। ... যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল কর"ন।" (১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, সূত্র : খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পা., বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, পৃ. ২৩৬-৩৭)

শেখ হাসিনার সময়বায় দর্শন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শনের চিন্তাধারাকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ, লালন ও বাস্তবাস্তবায়ন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য যে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন তা আজ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে দৃশ্যমান। এ যেন 'বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে'-এ কথারই পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। দেবতুল্য পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দর্শন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তাঁর (শেখ হাসিনা) মতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালেই জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে এ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে।" (১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, সূত্র : খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পা., বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, পৃ. ২১৮) এ জন্যই বঙ্গবন্ধু কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণ বিতরণ-সকল ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে শেখ হাসিনা দৃঢ়ভাবে মনে করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন ও যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। দেবুতল্য পিতা বঙ্গবন্ধুর এই চিন্তাচেতনার আলোকেই শেখ হাসিনা সমবায়কে বহুমুখী সমবায় হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ ও প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, যার ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নিম্নে শেখ হাসিনার সমবায় দর্শনের বাস্তবসম্মত কয়েকটি উদ্যোগ ও প্রকল্প তুলে ধরা হলো :

একটি বাড়ি একটি খামার (আমার বাড়ি আমার খামার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি দেবোচিত দর্শন চিন্তাধারার ফসল হলো 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক প্রকল্পটি। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পরপরই শেখ হাসিনা তাঁর দেবতুল্য পিতা বঙ্গবন্ধুর 'গ্রাম সমবায়' চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের একটি প্রকল্প প্রণয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থির কারণে বিলম্ব হলেও ২০০৯ সালে তাঁর উদ্যোগে এবং বঙ্গবন্ধুর 'গ্রাম সমবায়' দর্শন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মেয়াদ প্রথম পর্যায়ে জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাকলেও ২০১৭ সালে ঘোষণা করা হয় যে, "এ প্রকল্প বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর না হওয়া পর্যন্ত চলবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প থাকবে।" (সূত্র : কালের কণ্ঠ অনলাইন; ১০ আগস্ট, ২০১৭) এ প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণে গ্রামে পূর্বনির্ধারিত প্রকাশ্য সভায় ৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষসহ মোট ৬০ জন গরিব উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ের ট্যাগ অফিসার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীগণ গরিব নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং একজন শিক্ষিত ও বিশ্বস্ত ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়। কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, নার্সারি ও গবাদি পশুপালন বিষয়ে প্রতি সংগঠন হতে প্রতি বিষয়ে একজন করে উপকারভোগী বাছাই করে তাদেরকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে গ্রামে প্রদর্শনী খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উপকারভোগীগণকে তাদের গৃহীত প্রকল্পে সহজশর্তে পুঁজি সহায়তা/ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, সদস্য সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ বোনাস প্রদান, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসত্তাকে শাণিতকরণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করাই এ প্রকল্প কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। (সূত্র : http ://ekeb.babuganj.barisal.gov.bd/) মূলত এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি করে সুফলভোগীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়। জাতির পিতার সমবায় দর্শনকে ধারণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য খামারসহ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির খামার ও ফসলের বীজ বিতরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের নতুন নামকরণ করেন 'আমার বাড়ি আমার খামার'। (সূত্র : Bangla

Insider; ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) প্রকৃতপক্ষে ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ এই স্লোগানের অনুকরণে জনগণকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানমূলক কমসূচি ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ শীর্ষক প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ও কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রকল্প সম্পর্কে The Daily Observer (21 June, 2020) পত্রিকার ‹The rural developmemt programme has changed lives of many others... It is one of the 10 exclusive projects introduced by Prime Minister Shiekh Hasina." এজন্যই শেখ হাসিনা নির্দেশিত ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন, পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটিরশিল্প, মৃৎশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোল্ট্রি শিল্প, কম্পিউটার, গবাদি পশুপালন, ক্যাটারিং, ড্রাইভিং, ফুল সাজানো, দর্জির কাজ, ব্লক-বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্ট ইত্যাদি কর্মমুখী প্রশিক্ষণ থেকেই শিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ও কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়কে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এখন ‘সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ’ হিসেবে বিশ্বদরবারে অতি পরিচিত।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় দর্শননের অন্যতম প্রধান চিন্তাধারা হলো ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ (‘আমার বাড়ি আমার খামার’) প্রকল্পটি। এ প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ২০১৪ সালে তাঁরই অভিপ্রায়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকে নিয়ে সমিতি করে সমিতির তহবিল গঠন, সদস্যদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগণের দরিদ্রতা বিমোচন, নারীদেরকে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, সমিতি ও সদস্যদের সঞ্চয় ও অর্জিত সম্পদের লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশ থেকে দরিদ্রতা বিমোচন করা। নারীদের ক্ষমতায়ন এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রতিটি সমিতিতে ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন মহিলা সদস্য রয়েছে। ব্যাংক সমিতিসমূহের এসএনডি হিসাব, সদস্যদের সঞ্চয়ী আমানত হিসাব, মাসিক ডিপোজিট হিসাব, স্কুল ব্যাংকিং হিসাব ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। সমিতির সদস্যের কৃষিপণ্য যাতে কম মূল্যে বিক্রি করতে না হয় তার জন্য স্বল্প সেবামূলে ঋণ প্রদানসহ অন্যন্য বিভিন্ন উৎপাদনমুখীখাতে স্বল্প সেবামূল্যে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক সদস্যগণের উন্নয়নকল্পে নতুন নতুন খাতে ঋণ প্রদান এবং নিজস্ব অনলাইন ব্যাংকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। সদস্যদের কাছে আর্থিক সেবা আরো সহজলভ্য করার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব ডিজিটাল আর্থিক সেবা ‘‘পল্লী লেনদেন’’ চালু করা হয়েছে। এ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের সেবামূল্য মাত্র ৮% এবং এসএমই ঋণের সেবামূল্য মাত্র ৫%। গ্রাম সমিতির সদস্য তথা ব্যাংকের সদস্যগণ অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির হলেও তাঁদের বাড়িতে আয়বর্ধক কৃষিজ খামার স্থাপন করে আয়বৃদ্ধিপূর্বক দরিদ্রতা বিমোচনে বদ্ধপরিকর। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সদস্যদের ৩৩% গবাদি পশু পালন, ২১% সদস্য হাঁস-মুরগি পালন, ১১% সদস্য মৎস্য চাষ ও ১২% সদস্য কৃষি খামার স্থাপনে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। এ ব্যাংক দেশের দরিদ্র জনগণের দরিদ্রতা বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে শেখ হাসিনার সমবায় দর্শন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (সূত্র : www.pallisanchaybank.gov.bd/)

বিশ্ব আজ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে বিপর্যস্ত, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ ঘরবন্দি। স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, করোনা সংকটে আড়াই কোটি মানুষ তাদের চাকরি হারাবেন। আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। এ বিপর্যস্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘‘মনে রাখতে হবে, কৃষি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এখন সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক স্থবিরতা এসে গেছে। দুর্ভিক্ষও দেখা দিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের দেশকেও যেমন বাঁচাতে হবে, পাশাপাশি অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করতে হবে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ সাহায্য চেয়েছে এবং আমরা তাদের জন্য খাদ্যশস্যও পাঠিয়েছি। সে জন্য এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে।’’ (সূত্র : দ্য ডেইলি স্টার; ৫ মে ২০২০) অর্থাৎ আজকের এ বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা তাঁর ‘সমবায় দর্শন’ চিন্তাধারা বাস্তবায়নে আরো সংকল্পবদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ‘গ্রাম সমবায়’ দর্শনের চিন্তাচেতনার আলোকে শেখ হাসিনা নির্দেশিত ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে’ কথাটির বাস্তবায়ন হলেই কেবল বাংলাদেশ হবে ‘সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ’। তাহলেই শেখ হাসিনার সমবায় দর্শন বাংলাদেশের সুসম ও টেকসই উন্নয়নে আরো ব্যাপকতা লাভ করবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় তাঁর এ দর্শন হবে দেবোচিত একটি সার্থক চিন্তাধারা।

জয় হোক এ দেশের গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন, জয় হোক বঙ্গবন্ধুর ‘গ্রাম সমবায়’ দর্শনের, জয় হোক শেখ হাসিনার সমবায় দর্শনের।

মো. রফিকুল ইসলাম : বিএ (সম্মান), এমএ, এমফিল (ঢা.বি.), পিএইচডি গবেষক, ঢা.বি., সহকারী অধ্যাপক, দর্শন, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর সোনালি স্বপ্ন : তাঁতিদের স্বর্গভূমি সিরাজগঞ্জের তাঁতশিল্পের বর্তমান দুরবস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে উত্তরণের উপায়

সামিউল ইসলাম

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।... কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।’ ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু এ কথাই দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন। গ্রাম বাংলার উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে জাতির পিতা সমবায়কেই বেছে নেন। জাতির পিতার উন্নয়নের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ ছিল দেশের বর্তমানের এই তৃতীয় বৃহত্তম কর্ম খাতের সাথে জড়িত তাঁতি সমাজ যারা আমাদের মৌলিক চাহিদা বস্ত্রের যোগান দিয়ে থাকেন। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তাঁর শাহাদতের পর সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে তার সোনার বাংলার মেহনতি তাঁতি সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সমবায়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকল্প নেই। সিরাজগঞ্জে তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তাঁতিদের প্রশিক্ষণ ও সীমিত পরিসরে স্বল্প সার্ভিস চার্যে স্বল্প পরিমাণে ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ বর্তমানে চালু রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সেটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও

পরিপূর্ণভাবে তাঁতিদের ভাগ্য পরিবর্তনে কোনো স্থায়ী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাঁতিদের মূল সমস্যা অতিরিক্ত দামে কাঁচামাল ক্রয় ও কম দামে তাঁত পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হওয়া, আর এক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁতিদের সমবায়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী সুবিধাবাদীদের দৌরাত্মকে বিদায় দেয়া। জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের যে সুদূরপ্রসারী এবং ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন পুনরায় সেটি বাস্তবায়ন করেই তাঁতিদের পুরোনো আর্থসামাজিক গৌরব ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

সিরাজগঞ্জের বর্তমান তাঁত চিত্র ও তন্তুবায় সমবায় সমিতি : তাঁত শিল্প হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম কুটিরশিল্প খাত। দেশের কর্ম খাতের বিবেচনায় কৃষি আর গার্মেন্টসের পরেই তাঁতের অবস্থান। আর বৃহত্তর পাবনার যমুনা বিধৌত সিরাজগঞ্জ জেলা হচ্ছে এই তাঁত শিল্পের স্বর্গভূমি। তাঁত শিল্পের কার্যক্রম অনেকটা কৃষিকাজের মতো, যেখানে একটা তাঁত পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই এই কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন। পরিবারের সকলের হাতের ছোয়ায় তৈরি হয় এক একটা শাড়ি, লুঙ্গি কিংবা গামছার মত তাঁত পণ্য। সিরাজগঞ্জের তাঁত পণ্যের মধ্যে বর্তমানে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, গামছা, থ্রিপিস প্রধান। মূল ক্রেতা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত পাইকারি ব্যবসায়ী। এছাড়া ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এ অঞ্চলের তাঁত পণ্যের চাহিদা রয়েছে বলে তাঁতিদের কাছে জানা যায়। তবে পূর্বে ভারতে এ অঞ্চলের তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতির যে চাহিদা ছিল, বর্তমানে তা প্রায় হারানোর পথে। এখন উল্টো এদেশের বাজারে ভারতীয় শাড়ির আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দেশীয় তাঁতি শাড়ির বাজার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তাদের মতামত। সিরাজগঞ্জে তাঁত রয়েছে মূলত দুই ধরনের, প্রথমত, পুরনো পদ্ধতির হ্যান্ড লুম, দ্বিতীয়ত, আধুনিক পাওয়ার লুম। হ্যান্ড লুমের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় চিত্তরঞ্জন মডেলের তাঁত, যাতে দিনে প্রায় চারটি করে শাড়ি বোনা যায়। অপর আরেকটি হচ্ছে পিট লুম যেটিকে আঞ্চলিক ভাষায় খটখটি তাঁত বলে, এর উৎপাদন খুবই কম, দিনে সর্বোচ্চ দুইটি শাড়ি বোনা যায় এই তাঁতের মাধ্যমে। তবে উৎপাদন খরচ এবং সময় উভয় দিক বিবেচনা করে এখন প্রায় সব তাঁতি পাওয়ার লুমের দিকে ঝুঁকছে। ফলে ক্রমেই চিরায়ত হ্যান্ড লুমের জায়গা দখল করে নিচ্ছে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক পাওয়ার লুম, যেখানে একটা পাওয়ার লুমে দৈনিক সাতটি পর্যন্ত শাড়ি বোনা সম্ভব। এক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরিও কম। সিরাজগঞ্জে মোট তাঁতি পরিবার রয়েছে প্রায় ৫০,০০০। এসকল পরিবারের মালিকানায় প্রায় ১,৫০০ তাঁত কারখানায় তাঁত রয়েছে ৪ লক্ষাধিক। সিরাজগঞ্জের এই তাঁত শিল্প কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে প্রায় ২ লক্ষ লোকের। প্রতি বছর তাঁত থেকে এ জেলায় উৎপাদিত হয় প্রায় ২ কোটি মিটার বস্ত্র।

সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার প্রবণতা এ অঞ্চলের তাঁতিদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সুদূর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা না থাকায় তারা সমবায়ের সুফল পাচ্ছে না এবং নতুন প্রজন্মের তাঁতিদের কাছে সমবায় শক্তি অজানাই থেকে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে সমবায়ের আওতাভুক্ত তাঁতি পরিবার রয়েছে ১,৩৯২ টি। তাঁতিদের নিয়ে গঠিত প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি রয়েছে ৫৩টি। এসকল সমবায় তাঁতি পরিবারে তাঁত রয়েছে প্রায় ৮০০০ এর মত। জেলাস্থ প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়েছে ৪ টি। এ সকল তন্তুবায় সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন বেশির ভাগ জীবিত সদস্যই আজ সত্তোরোর্ধ বয়স্ক। তন্তুবায় সমবায় সমিতির সোনালি সময়ের সাক্ষী তারা। কিন্তু দিনদিন বিভিন্ন কারণে তাঁতিদের অবস্থার অবনতির দরুন তারা নিজেরাই পূর্ব পুরুষদের এই পেশা ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় রুজি রোজগারের আশ্রয় খুজছে।

সিরাজগঞ্জ তথা বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের দুরবস্থা ও তার কারণ : তাঁতিদের কাজ সম্পন্ন হয় মূলত কয়েকটি ধাপে। প্রথমত তাঁত পণ্য উৎপাদনের জন্য তাদের কাঁচামাল কিনতে হয়। এই কাঁচামালের মধ্যে রয়েছে প্রধানত সুতা ও রং। এছাড়াও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল, হাইড্রাস, কসটিক, অ্যাসিড, নাইট্রিক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁতিরা এই সকল প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করে স্থানীয় বাজার হতে। স্থানীয় বাজারে দেশে উৎপাদিত সুতার পাশাপাশি আমদানিকৃত সুতাও পাওয়া যায়। তবে দেশি সুতার পরিমাণই বেশি। স্থানীয় খুচরা বাজারে সুতা বিক্রি হয় পাউন্ড হিসেবে। মধ্যম মানের প্রতি পাউন্ড সুতা প্রায় ২১০ টাকা দরে বিক্রি হয় যেখানে একই মানের প্রতি পাউন্ড সুতার মিল রেট অর্থাৎ কারখানা হতে ক্রয় মূল্য প্রায় ১৮০ টাকা। প্রতি পাউন্ডে মূল্য পার্থক্য দাঁড়ায় সুতা ভেদে প্রায় ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত। এই টাকা যায় মূলত গুটি কয়েক মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে যারা খুচরা বাজারে নিজেদের ইচ্ছাস্বাধীনভাবে সুতার বাজার মূল্য নির্ধারণ করে রাখে। আর তাঁতিরা তাদের নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্যে সুতা কিনতে বাধ্য হয়। এরপর যেসকল তাঁতিদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারা বেশিরভাগ সময় মহাজন তথা বড় কাঁচামাল বিক্রির দোকান থেকে সুতাসহ অন্যান্য কাঁচামাল বাকিতে ক্রয় করেন। তাদের এই বাকির টাকা পরিশোধ করতে হয় বাংলা চৈত্র কিংবা বৈশাখ মাসে দোকানের হালখাতার দিন। দেরিতে টাকা পরিশোধ করার দরুন বাজারমূল্যের চেয়েও অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয় বাকি নেওয়ার হিসেব খাতায়। এখানেও তাদের কাছে তাঁতিরা অনেকটা জিম্মি হয়ে থাকে চরা মূল্যে সুতা কিনতে। অনেক সময় তাঁতিরা অর্থ সংকটে পড়লে স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে কিংবা বিভিন্ন এনজিও হতে ঋণ নিয়ে থাকেন যেখানে পরের সপ্তাহ হতেই প্রতি সপ্তাহে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এসকল এনজিওর সুদের হার ১৫% বলা হলেও পারতপক্ষে তা ৩০% পর্যন্ত দাঁড়ায়। রং কেনার ক্ষেত্রেও একই চিত্র। এ অঞ্চলে সরবরাহকৃত রং আসে মূলত বিদেশ হতে আমদানির মাধ্যমে। বিভিন্ন এজেন্ট আমদানি করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ কেজি প্রতি প্রায় ১০০ টাকা লাভে বিক্রি করেন তাঁতিদের কাছে। এক্ষেত্রেও মূল্য নির্ধারণে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট কাজ করে। বাজার মূল্য নির্ধারণ হয় তাদের ইচ্ছানুযায়ী। তাঁতিরা বাধ্য হয়ে তাদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যেই রং কিনে থাকে। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ক্রমাগত সুতা রঙের দাম বৃদ্ধি হলেও তুলনামূলকভাবে তাঁত পণ্যের দাম না পাওয়া তাদের প্রধান সমস্যা। যদিও খুচরা বাজারে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, থ্রিপিস প্রভৃতির দাম পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাঁতিদের পরিবর্তে এর সুফল ভোগ করছে আরেক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগীরা। তাঁতিরা যে দামে ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁত পণ্য বিক্রি করে, খুচরা বাজারে সাধারণ ক্রেতার হাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার দাম বেড়ে যায় ২ থেকে ৩ গুণ। তাঁত মালিকগণ তাঁত শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করেন সপ্তাহ ভিত্তিতে। সাধারণত স্থানীয় হাটবারে হাটে তাঁত পণ্য বিক্রি করে পরের দিন শ্রমিকদের মজুরি দিতে হয়। সেক্ষেত্রে দাম কম বেশি যাই হোক তাঁতিদের বাধ্য হয়ে তাদের পণ্য বিক্রি করতে হয়। এসময় অনেক ব্যবসায়ীরা অল্প দামে তাঁত পণ্য কিনে মজুত রেখে পরে বেশি দামে বিক্রি করে। তাঁতিদের হাতে পর্যাপ্ত পুজি না থাকায় তারা দাম কম পেলেও নিজেদের পণ্য নিজেরা মজুত করে রাখতে পারে না, টাকার প্রয়োজনে কম দামেই বিক্রি করে দেন। তবে তাদের সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন পাওনাদার দোকানে হালখাতা হয়। তখন পুরো বছরের সকল দেনা পরিশোধ করতে হয়। এই দেনা পরিশোধের জন্যও তাদের অনেক সময় উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে তাঁত পণ্য বিক্রি করতে

হয়। অনেক সময় আর্থিকভাবে অসচ্ছল তাঁতিরা ধার দেনা করে তাঁত চালানোর পর ন্যায্যমূল্য না পেয়ে দেনা পরিশোধের জন্য নিজেদের তাঁতই বিক্রি করে দেন। এরকম ঘটনা এখন মাঝে মাঝেই ঘটছে। এক দিকে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে অতিরিক্ত দামে কাঁচামাল কিনতে হচ্ছে অপরদিকে আরেক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উভয় দিকের এরকম প্রতিকূল পরিবেশেই আজ তাদের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। এই অবস্থায় তাঁতিরা বিশেষ করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল তাঁতিদের অনেকেই তাঁত বিক্রি করে তাদের এত বছরের পূর্ব পুরুষদের লালিত পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। বেচে থাকার তাগিতে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। যে পেশার সাথে আবেগ ভালোবাসা জড়িত পূর্ব পুরুষদের সেই পেশা ছেড়ে এখন অনেকেই ঢাকাসহ অন্যান্য শহরমুখী হচ্ছে। শহরে এসে এরা কেউ কেউ ভাসমান মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করছে, চা পান বিক্রি করছে। কেউ কেউ সামর্থ্য অনুসারে ছোটখাটো চাকরি কিংবা শ্রমিকের কাজ খুঁজে নিচ্ছে। এর একটি সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শহরাঞ্চলে।

সমবায়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় : জাতির পিতা দেশ স্বাধীনের পর দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের তাঁতি সমাজও তার বাইরে নয়। তাঁতিরা যাতে ন্যায্যমূল্যে সুতা কিনতে পারেন তার জন্য সমবায়ের মাধ্যমে মিল রেটে অর্থাৎ কারখানা হতে প্রকৃত বিক্রয় মূল্যে তাঁতিদের কাছে সুতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁতিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সমবায় শিল্প ইউনিয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় শিল্প ইউনিয়ন থেকে প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি হয়ে তাঁতিদের হাতে ন্যায্যমূল্যে সুতা পৌঁছে দেয়া হতো। এই তাঁতি সমবায়ীদের জন্য দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত সুতার ৩৫% বাধ্যতামূলকভাবে রেখে দেয়া হতো। পরবর্তীতে তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হতো। এর বাইরেও জাতীয় সমবায় শিল্প ইউনিয়নের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সুতা, রং প্রভৃতি আমদানি করে তা সদস্য তন্তুবায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাঁতিদের কাছে ন্যায্যমূল্যে পৌঁছে দেয়া হতো। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাবনাকে ধারণ করে তাঁতিদের মাঝে বিদ্যমান বর্তমান সমস্যাসমূহের পূর্ণ সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, তাঁতিদের সুতা, রং ব্যবসায়ী মধ্যস্বত্বভোগীদের আর্থিক জুলুম থেকে রক্ষা করতে আবার একই পদ্ধতির পুনঃবাস্তবায়ন করতে হবে। সিরাজগঞ্জ তথা সারা দেশের তাঁতিদের সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করতে হবে। সমবায়ী তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা সরবরাহের জন্য দেশে উৎপাদিত সুতার যৌক্তিক একটা অংশ সমবায় অধিদপ্তর ও জাতীয় সমবায় শিল্প ইউনিয়নের মাধ্যমে মিল রেটে তাঁতিদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সমবায় শিল্প ইউনিয়নের পাশাপাশি তাঁতিদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বিদেশ থেকে যাতে রঙ সহ তাঁত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করে সেগুলো ন্যায্যমূল্যে সমিতির মাধ্যমে তার তাঁতি সদস্যদের কাছে বিক্রি করতে পারে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সুতা আর রঙের সাথে সম্পৃক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমবে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্প পুজির তাঁতিদের জন্য ২ বছর মেয়াদে তাঁত প্রতি ১ লাখ টাকা করে ২% সার্ভিস চার্জে জন প্রতি সর্বোচ্চ ৬ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করার জন্য সমবায়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করে সমবায়ের আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিলে তা অধিকতর কার্যকর হবে। এতে তাঁতিরা স্থানীয় এনজিও কিংবা মহাজনদের কাছ থেকে চরা সুদে যে ঋণ নিয়ে থাকে তার প্রভাব কমবে। দোকানে বাকিতে কাঁচামাল কেনার জন্য যে অতিরিক্ত দাম দিতে হয় সেটি থেকেও তারা মুক্তি পাবে। এছাড়া চৈত্র বৈশাখ মাসের হালখাতার হিসেব থেকেও তারা রেহাই পাবে।

তৃতীয়ত, খুচরা বাজারে তাঁত পণ্যের দাম বেশি থাকলেও যাদের পরিশ্রমে এই পণ্য উৎপাদন হয় তারা এর সুফল পায় না। এর সুফল পায় মধ্যস্বত্বভোগী দুষ্ট চক্র। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য উৎপাদনকারী তাঁতিদের কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সরাসরি পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য খুচরা বিক্রেতাদের সমন্বয়ে মার্কেট ভিত্তিক প্রাথমিক খুচরা কাপড় ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক খুচরা কাপড় ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক কেন্দ্রীয় খুচরা কাপড় ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদনকারী তাঁতিদের কাছ থেকে প্রাথমিক বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য চলে যাবে সরাসরি খুচরা বিক্রয়কারী কেন্দ্রীয় বা সরাসরি প্রাথমিক সমবায় সমিতির কাছে। এতে তাঁতিরা যেমন ন্যায্যমূল্য পাবে, একইভাবে খুচরা ব্যবসায়ীরাও তুলনামূলকভাবে কম দামে তাঁত পণ্য কিনতে পারবে। এতে সাধারণ ক্রেতারাও বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে তাঁত পণ্য কিনতে পারবে। ফলে বাজারে তাঁত পণ্যের বিক্রয় ও চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এসকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ তৈরি করতে সহযোগিতা করবে সমবায় অধিদপ্তর ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।

চতুর্থত, জাতির পিতা তাঁত শিল্পের বিকাশের জন্য প্রতি তাঁত শিল্প অধ্যুষিত জেলায় তাঁত মেলার আয়োজন করেছিলেন। তাঁত পণ্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সমবায় অধিদপ্তর ও তাঁত বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর একবার করে তাঁত সপ্তাহ পালন করা জরুরি। সে সপ্তাহ জুড়ে জেলায় জেলায় তাঁত মেলা চলবে, তাঁত পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও তাঁতিদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাদের সমস্যার কথা শোনা হবে, স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে যৌথভাবে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, সেটি সম্ভব না হলে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হবে। এর মাধ্যমে তাঁতিদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তারা কাজের জন্য নতুন স্পৃহা পাবে।

পঞ্চমত, সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করে অন্যান্য সমবায় পণ্যের পাশাপাশি তাঁত পণ্য বিক্রির জন্য মার্কেট চেইন তৈরি করতে হবে। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনার পাশাপাশি প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে সমবায় মার্কেট চালু করতে হবে। এর মাধ্যমে তাঁত পণ্য তথা সকল সমবায় পণ্যের বাজারজাতের পাশাপাশি ইতিবাচক প্রচার ও প্রসার হবে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "সমবায় নীতি" প্রবন্ধ গ্রন্থের "সমবায় ১" প্রবন্ধে লিখেন "এখনকার দিনে ব্যবসা বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়, ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড় হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ঙ্কর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।" প্রকৃতপক্ষেই মধ্যস্বত্বভোগীদের চাতুরিকে বিদায় দিয়ে তাঁতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যায্যমূল্যে তাদের কাঁচামাল ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে তাঁত পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য সমবায়-প্রণালির বিকল্প নেই।

সামিউল ইসলাম : জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ

উৎপাদন, বিপণন ও কর্মসংস্থানে সমবায়

মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ

সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন, বিপণন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালনে সমবায় সমিতিসমূহের বিচরণ দৃশ্যমান এবং অবদান প্রশংসনীয়। কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থায় সমবায়ের অবদান অসামান্য। সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা স্থাপনে সহায়ক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ জীবনে সৌহার্দ ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতসহ টেকসই অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। প্রত্যেক সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিট যা অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধন, ভারসাম্য সংরক্ষণ, পরিবেশ ও সামাজিক চাহিদা পূরণে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার বিস্তার রয়েছে গ্রামীণ জনপদে, নগর সভ্যতায় এবং আধুনিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থই বলেছেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে' এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে এদেশের যুবক শ্রেণিকে চাকরির পিছনে না ঘুরে উদ্যোক্তা হয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, উৎপাদন, বিপণন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ দেশের সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করতে পারে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণন

বিশ্বব্যাপী অনেক দেশেই এখন খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে তা আরো ব্যাপকহারে রূপ নিবে। আমাদের দেশে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে তা আমদানি করাও কঠিন হয়ে যায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তাবলয়ে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। এখনই সময় গ্রামের কৃষক ও বেকার যুবকদের সুসংগঠিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দেশের অনাবাদি জমি চাষের

আওতায় আনা, দেশের মানুষের চাহিদামতো পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনতে উৎপাদক হতে সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা করা। দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পণ্যের মূল্য নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগী কমিয়ে আনতে হবে। তাহলে কৃষক ন্যায্যমূল্য প্রাপ্ত হবেন। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পণ্য পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাজার সিন্ডিকেট চক্র পণ্যের মজুত করে সাধারণ ভোক্তাদের জিম্মি করতে সক্ষম হবে না। সমবায় হচ্ছে শত বছরের প্রাচীন পরীক্ষিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যম। বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা উত্তরণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে শুরু হয় সমবায়ের অভিযাত্রা। গণমুখী অর্থনীতিবিদরা মনে করেন খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে সমবায় উদ্যোগ। তাই সমবায়কে দিতে হবে উদ্দীপনা, সরকারি সকল সহযোগিতা, বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ। সমবায় হচ্ছে সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং বাজারভিত্তিক অর্থনীতির সোপান, যেখানে ব্যাপক অংশীদারিত্ব ও পর্যালোচনার সুযোগ বিদ্যমান। সমবায় ব্যক্তি ও সমষ্টির উদ্যোগে বিশ্বাস করে, কিন্তু কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সমবায় যেমন বিধিবদ্ধ তদারকি ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনি সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ। সমবায় সমিতিসমূহ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং একই সঙ্গে দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধে সহায়তা করে। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছলতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে, কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কাঠামোগত সমন্বয়, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, সমবায় পদ্ধতির অনুসরণ এবং সরকারের সহায়ক নীতি ও যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। বর্তমানে ২৯ প্রকার সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জেলা ভিত্তিক যুব, বহুমুখী, আবাসন, বিপণন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সঞ্চয় ও ঋণদান, পরিবহন, উৎপাদন (কৃষি, মৎস্য, তাঁতি, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, দুগ্ধশিল্প ইত্যাদি) সমবায় সমিতি নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। জেলার ইউনিয়নগুলোতে প্রত্যেক প্রকারের একটি করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে সমিতির সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এতে উৎপাদন, বিপণন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, ঋণদানের মাধ্যমে এলাকার বেকার পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ করা সম্ভব হবে। 'সমবায় শক্তি' সমবায় বিভাগের অব্যবস্থাপনার কারণে আজ এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ঝিমিয়ে পড়ছে। সমবায় বিভাগকে শক্তিশালী করে এবং কর্মঠ, উদ্যোগী সমবায়বান্ধব কর্মকর্তাদের খুঁজে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন ও তাদের সঠিক তদারকির মাধ্যমে টেকসই সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে পারলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপ্লব ঘটবে। বর্তমানে দেশের অন্যতম সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে বেকারত্ব। এই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে উদ্যোক্তা তৈরি করে সমবায় সমিতি গঠন করে সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে কাজ করলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

সমবায় সমিতির জন্য প্রতিবন্ধকতা

সমবায় সমিতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে-(১) সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের মূলনীতি অংশের ১৩ নং ধারায় অর্থনীতি তথা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দেখা যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তিন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু দেখা যায় রাষ্ট্রের দুটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সমবায় মালিকানা খাতকে এমনভাবে অবজ্ঞা করছেন যা মালিকানায় উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনকে নীতি নির্ধারণকারীরা চিন্তাতেই রাখেন না; (২) আর্থিক সহযোগিতার জন্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যেখানে দেশের ব্যাংক ও বিমার জন্য রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এনজিওগুলোর জন্য রয়েছে পি.কে. এস.এফ। অথচ সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহযোগিতার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি; (৩) সমবায় বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার অভাবে আজ দেশের সমবায় বিভাগ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে এবং স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তার প্রতিহিংসার স্বীকার হয়ে অনেক সমবায় সমিতি নিরুৎসাহিত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে। দেশের নিবন্ধিত সমবায় সমিতির

সঠিক তদারকি না থাকার কারণে সমবায় সমিতিগুলো ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এই স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তাদের খুঁজে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের চালিকা শক্তি সমবায় বিভাগ বিলীন হয়ে যাবে। তাই সম্ভাবনাময় এই খাতকে অবহেলা, অবজ্ঞার কারণে দেশের মূল চালিকা শক্তির উপর ব্যাঘাত ঘটছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যেখানে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেখানে তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি তাঁর পিতার স্বীকৃতির মর্যাদা নিয়ে অবশ্যই ভাববেন।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন, বিপণন ও কর্মসংস্থান বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবনা

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার বাস্তবায়নে সমবায় সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্যে দেশের ১০০ টি সফল ও টেকসই প্রাথমিক সমিতির অর্থায়নে একটি জাতীয় সমিতি গঠন করে জাতীয় সমিতির মাধ্যমে নিম্নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সমবায়ের দৃশ্যমান ভূমিকা দেশের মানুষ দেখতে পারবে এবং সারা দেশের সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সমিতি, সমবায়ী, সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্টরা এবং দেশের জনগণ সমবায়ের মাধ্যমে তার সুফল ভোগ করতে পারবে।

১. পণ্য উৎপাদন ও বিপণন : জাতীয়ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করতে শিল্প কারখানা স্থাপন করে পণ্য উৎপাদন, মিল্কভিটার উৎপাদিত দুগ্ধ পণ্য, বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত উপকরণ, কৃষক ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ করে তা সমবায় বাজার স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বিপণন (উৎপাদক হতে সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রয়) করা সম্ভব হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

২. স্বাস্থ্যসেবা : জাতীয়ভাবে সমবায় হাসপাতাল নামে আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হলে, সারা দেশের সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সমিতি, সমবায়ী, সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের সুযোগ তৈরি হবে।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : জাতীয়ভাবে সমবায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নামে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে, সারাদেশের সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায়ী, সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

৪. আর্থিক সংস্থা : দেশের নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক সহযোগিতার জন্যে সরকারি কোনো সংস্থা নেই। এমন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থাকলে বিশেষ সময়ে অথবা দুর্যোগে আর্থিক সুবিধা বা প্রণোদনা পেতে পারত। এটি সমবায় সমিতির জন্য বড় একটি সংকট। কারণ কখনো কখনো সমবায় সমিতিগুলোর তারল্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে অনেক প্রতিষ্ঠান অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক-কে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করে নিবন্ধিত সমবায় সমিতি, সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সমবায়ের জন্য শক্তিশালী একটি আর্থিক সংস্থা হিসাবে রূপান্তরিত হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে সমবায় বিভাগের দৃশ্যমান সাফল্য দেশের মানুষ দেখতে পারবে এবং দেশের উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বনির্ভরতা অর্জন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ, ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয়/বিক্রয়সহ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সমবায় বিভাগ সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠানে রূপ নিবে। অবহেলিত সমবায় বিভাগ হবে দেশের উন্নয়নে বড় হাতিয়ার ও সরকারের অংশীদার হিসেবে সমবায় বিভাগ হবে একটি ব্র্যান্ড। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা হবে ব্যাপক ও প্রশংসনীয়।

দূর হোক বেকারত্ব, নির্মূল হোক দরিদ্রতা, অর্জন হোক স্বনির্ভরতা, নিয়ন্ত্রণ হোক দ্রব্যমূল্য, সফল হোক সমবায়।

মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ : মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী) ও সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি, চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও সমবায় চেতনা

মোঃ নাসির উদ্দীন

ক্ষণজন্মা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতা সংবর্ধনা সমাবেশে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন । ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন । (১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক- এটি যেমন সত্য; তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধুর জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণমুখী উন্নয়ন ভাবনায় আমরা সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। এ বছর জাতীয় পর্যায়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ : ২০২০-২০২১। আলোকিত মুজিববর্ষের প্রাক্কালে ২০১৯ সালের ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'। আমরা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে সমবায় ও এর প্রাসঙ্গিকতা, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দ্যোতনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কার্যকর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 'সমবায় আন্দোলন'কে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' দর্শনকে 'জাতির পিতার সমবায় বাংলায় কার্যকর করতে পারি। আর তা হলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাযজ্ঞে 'সমবায় আন্দোলন'কে সম্পৃক্ত করে জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের ১৯৫টি দেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।

ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৪০ তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত পাশ হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে ইউনেস্কো যুক্ত হওয়ায় মুজিববর্ষ উদযাপনকালে দেশ জুড়ে নানা কর্মসূচি পালনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন আরো ব্যাপক পরিসরে প্রসার লাভের সুযোগ সৃষ্টি হলো।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির মহান নেতা, স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে লন্ডন যান, লন্ডন থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এসে কি দেখতে পেলেন? যেখানে হাত দেন দেখেন শুধু সমস্যার পাহাড়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হাল ধরলেন। তিনি বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন। দেশ গড়ার কাজে সবাইকে আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। সমবায়ের অগ্রণী চিন্তায় থাকতেন। সেই সময়ে অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যখন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে যেখানে তাকায় শুধু হাহাকার। একদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রায় গ্রামবাসীর ঘর পুড়ে গেছে সেই দৃশ্য, অপরদিকে শহিদ পরিবারের স্বজন হারানোর কান্না, ধর্মীয় পরিচয়ের বাহিরে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে একে অপরকে যার যা সামর্থ্য আছে তাই দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। কৃষি, খামার, মিল কারখানা, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট সমস্ত সমস্যাকে অন্তরে নিয়ে সাহসের সাথে এ সংকট মোকাবেলা করতে বঙ্গবন্ধু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সমবায়ের ৭ টি শর্ত: ঐক্যবদ্ধতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত হয়।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু, তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা পাই...

"কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, ওটা থাক, ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। যেটা করে একটি ডিস্ট্রিকে একটি করে করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ.... একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ্ তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিকে একটা কো-অপারেটিভ মানুষ দেখে, এই দেশের মানুষ এই উপকার হয়েছে, তা হলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। কাজ শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।"

এ জন্য বঙ্গবন্ধু গ্রাম বাংলায় গ্রাম সমবায় সমিতি করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় গঠনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেছিলেন।

"নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেটিভে গিয়েছি। আমি খোদাকে হাজের-নাজের মেনে কাজ করি। চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি, ৬০টা থেকে ৭৫টা কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করবো।"

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বা সবুজ বিপ্লবের ডাকে তাঁর ভাষণ... ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই- যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান। এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়াকার্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটারদের বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশ বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে।"

খ্যাতিমানদের সমবায় বিষয়ে ভাবনা বিষয়ে আমরা পাই "ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন ও স্বল্প জমির অধিকারী চাষীদের জন্য ব্যাপক পল্লী পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা।"

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন- " আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেন না সমবায়ের পথ, সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।"

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে দেখতে চাই না। আমি চাই আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এজন্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।"

সমবায় বিষয়ে মনীষীদের উক্তি :

- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ উক্তি বা সমবায় সংগীত

"ও'রে নিপীড়িত, ও'রে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়,
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র, সমবায় সমবায়।
(কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী)

- কবি কামিনী রায়-এর সমবায়ের উক্তি

সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বলেছেন-

'We all do better when we work together. Our differences do not matter but our common humanity matters more.'

- ড. আকতার হামিদ খান এর সমবায় চিন্তা :

"আপনারা যারা শ্রমিক, যারা ভিন্ন ভিন্ন থাকায় দুরবস্থায় পড়েছেন তারা একত্র হোন, আর আপনাদের টাকা পয়সা একত্র করেন। পুঁজি সৃষ্টি করেন। যখন পুঁজি আর শ্রমের যোগ দিবেন তখন আপনাদের মতো আর শক্তিশালী কেউ থাকবে না।"

'ক্রেডিট ইউনিয়নে কোন অসৎ ব্যক্তির স্থান নেই'- ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি।

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি,

একজন হলিক্রস সম্প্রদায়ের ক্যাথলিক মিশনারি, এদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রদূত যিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন অব ঢাকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কানাডার এন্টিগনিসে গিয়ে ঐ বছর হাতেকলমে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে সমবায়ের জন্য কাজ করেন। তাঁর হাতে গড়া দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্ব) একটি কো-অপারেটিভ ফেডারেশন যার অধীন প্রায় ১,০০০ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পৃক্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইতিহাসের বরপুত্র- ইতিহাসের মহানায়ক। তিনি বাংলা ও বিশ্বের সব শোষিত-নিষ্পেষিত-নির্যাতিত-অত্যাচারিত সর্বহারা মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিদূত। তিনি মনের গভীর থেকে আন্তরিক বিশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন 'বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। আমার কণ্ঠ শোষিতের মুক্তির জন্য চিরকাল সোচ্চার থাকবে।' দেশ-কাল ও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি সমুজ্জ্বল আপন আলোর ঝরনাধারায়। কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ করা চলে না-আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাংলাদেশের নয়-নয় কোনো দল বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের; তিনি আমাদের মহান জাতীয় সম্পদ-বৈশ্বিক রত্ন। তিনি বিশ্ব পরিমণ্ডলের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এ কথার সারবত্তা পাওয়া যায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার আবহে :

১.
প্রথম ঘটনার সূত্রপাত আমেরিকার নিউইয়র্কের রাস্তায়। খুব সম্ভবত ১৯৮১ সাল। আমাদের দেশের একজন কূটনীতিক সকাল বেলায় অফিসে যাওয়ার জন্য একটি ট্যাক্সিক্যাবে উঠেছেন। চালক নিগ্রো যুবক কিছুক্ষণ চলার পর কূটনৈতিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কোথা থেকে এসেছো-তোমার দেশ কোথায়?' কূটনীতিকের উত্তর 'বাংলাদেশ'। চলন্ত ট্যাক্সিক্যাবটি হঠাৎ তীব্রবেগে ব্রেক কষে থামিয়ে দিল যুবক চালক। রাগতভাবে ক্যাবের দরজা খুলে কূটনীতিককে বলল 'Get Out from my Cab. You Bastard- You Killed Mujib- your Father of the nation'. মুজিবের প্রতি নিগ্রো যুবকের ভালোবাসা প্রকাশ পেল মুজিবের দেশ বাংলাদেশের একজন নাগরিকের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে।

২.
দ্বিতীয় ঘটনার সূত্রপাত ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে। একজন বিদেশি পর্যটক একবার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করার পর পরিদর্শন বইয়ে লিখেছিলেন 'I hate the killers. They are Bastard- because- they are Bastard- because- they are Bastard- because- they are Bastard- because- they are Bastard- because- they are Bastard- because- they killed Mujib- the Poet of politics'. বিদেশি পর্যটক সাতবার খুনিদের জারজ সন্তান বলেছিলেন মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে সম্মান জানিয়ে এবং মুজিবের অসাধারণ মানবপ্রেমিক ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণ করে। শুধু দুজন বিদেশির এই দুটি ঘটনার দ্বারাই আমরা অনুধাবন করতে পারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবস্থানের কথা।

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।' আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুসম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

[১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে : (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা।

৩.
ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।]

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত পাই। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেমে আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের

দ্বারা। বঙ্গভবনের ওই বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন-...বিপ্লবের ডাক। ভেঙে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেটিভে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-'৪৮ সাল থেকে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের মেনে কাজ করি। চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সব কিছু নিয়ে সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি, ৬০টা থেকে ৭৫ কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করব। এই কো-অপারেটিভে যদি দরকার হয় সেন্ট্রাল কমিটির এক একজন মেম্বর এক একটার চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার সেল্ভস। ...লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মাল্টিপারপাস সোসাইটি-দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষি জমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা-এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমরা তার বক্তব্য থেকেই পাই- ...কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ...আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ... একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হব। ইনশাআল্লাহ তারপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভে মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও- আমাদের করে দাও।...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

আমাদের জাতির পিতার ভালোবাসায় মৌল অবস্থানে ছিল বাংলার জনগণ ও তাদের উন্নয়ন। সমবায় ছিল এই উন্নয়ন দর্শনের চালিকাশক্তি। বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তঃস্থলের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত প্রতিটি কথাই যেন তার দর্শনকে প্রকাশ করে।

সমাপনি মন্তব্য

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে আমরা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি-আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতি এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।

জাতির পিতার উপরোক্ত সমবায় দর্শনের আপ্তবাক্য আমাদের পথের দিশা দেখায়। আমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকেও আমাদের পাথেয় হিসেবে পাই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বহুমুখী গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং প্রধানমন্ত্রীর আবেগসিক্ত অঙ্গীকারের ভেতরেই রয়েছে সমবায় আন্দোলনকে জনগণমুখী ও উন্নয়নমুখী করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিশা। শতবর্ষের এই দিনে আসুন আমরা সেই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হই।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে কতিপয় বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকের হাতে নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দর্শন বা সমবায় বিষয়ে তাঁর চিন্তাচেতনা হারিয়ে যায়। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকার গঠনের পর তিনি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেন। সেই লক্ষ্যমাত্রায় বিভিন্ন কাজের সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর দর্শন কি ছিল? বঙ্গবন্ধুর দর্শন হলো, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। এই দর্শন বা পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাগ্রচিত্তে আজও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :

১.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে আগরগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবসের ভাষণে বলেছেন- "সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

২.

সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্পৃক্ততা মানেই সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করা। এ বছর গত ২ নভেম্বর ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিকাল ৫ টায় ৪৮ তম সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার প্রদান করেন। এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন ও অনলাইনে সমবায় বাজারের মালামাল বিক্রির ওয়েবসাইট এর উদ্বোধন করেন।

৩.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সমবায়ের ক্ষেত্রে সততাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ বছর সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন।' তিনি এবারের প্রতিপাদ্যকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন, '২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ

থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ পালিত হবে।'

৪.
বাংলাদেশে সমবায় সমিতির কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রকল্প 'একটি বাড়ী, একটি খামার' এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত অসংখ্য অসহায়, নিঃস্ব পরিবার ঠিকানা পেয়েছে। চলমান এ প্রকল্পের জন্য ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে যাচ্ছে। এছাড়া দেশব্যাপী সমিতিগুলো যেমন- ক্রেডিট ইউনিয়ন, বহুমুখী সমিতি, গৃহায়ন সমিতি, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সমিতি, তাঁতি সমিতি, কৃষক সমিতি, দিনমজুর সমিতিসহ আরো অনেক সমিতি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৫.
আজকের বাংলাদেশে আমরা কি দেখি? বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে স্ব-নির্ভরশীল করে গড়ে তুলছেন। একসময় চাউলসহ বহু ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/সামগ্রী আমদানি করতে হতো তা এখন উল্টো পথে হাঁটছে। সম্প্রতি সরকার চাউল রপ্তানী করেছে। যেসকল চিন্তাধারা অসম্ভব ছিল তা সম্ভব হয়েছে। স্বপ্নের পদ্মাসেতু দিনকে দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেল এখন কল্পনা নয় বাস্তব তা বাংলাদেশের আপামর জনগণ বুঝতে পারছে। মানুষের গড় আয়ু যেমন বেড়েছে তদ্রুপ মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শীঘ্রই পরিচিত হয়ে উঠবে। খাদ্যের অভাব নেই, খাদ্যের মধ্যে বৈচিত্র্যতা এসেছে। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখতেন, বাংলার মানুষ খাদ্য পাবে, বস্ত্র পাবে, চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে, বাসস্থান পাবে তা আর অবাস্তব নয়, শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের সিঁড়িতে ধাপে ধাপে সব স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি সরকারের ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সাফল্য এনে দিয়েছে। সমবায় বিভাগ তথা সমবায়ীদের সততা, একতা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তথা স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মানসে আমাদের দেশটি সমবায় সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নশীল দেশের যাত্রা বেগবান হউক। আমরা সকলে যদি বঙ্গবন্ধুর সমবায় আদর্শে আমাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করি এবং সকলে মিলে এক হয়ে সকল সমস্যার মোকাবেলা করি তাহলে সমাধানের পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এভাবেই "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" মানসিকতা নিয়ে প্রত্যেকে যদি জীবনযুদ্ধে মোকাবেলা করি তাহলে আমাদের আত্মজীবনের এবং আমাদের দেশের উন্নতির শীর্ষে পৌঁছাতে পারব আশা রাখি। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ সফলতার প্রত্যাশা রাখছি।

সহায়ক তথ্যসূত্র :
১) বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ।
২) ২৬ মে মার্চ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ।
৩) হরিদাস ঠাকুর, যুগ্ম-নিবন্ধক ও উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড-, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭।
৫) সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি.।

মোঃ নাসির উদ্দীন : সহকারী প্রশিক্ষক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী।

জীবন ও জীবিকার রোল মডেল সমবায়

রত্ন কান্তি রোয়াজা

মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সমবায়- জীবন ও জীবিকার উৎস। কেননা একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ-সমবেত প্রচেষ্টা সেখানে সফল। একক প্রত্যাশা যেখানে গুরুত্বহীন-সমন্বিত প্রত্যাশা সেখানে সার্থক। সমবায় মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে একে-অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে সাহায্য করে। সমবায় পদ্ধতি আমাদের জীবনাচার পরিশীলিত করে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে।

সমবায় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া—যা সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৌলিক চাহিদাপূরণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কেননা মানুষের অংশ গ্রহণ ছাড়া মানুষের জন্য উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন তখনই সম্ভব—যখন মানুষ একে অন্যের সহযোগী হয়,সহমর্মী হয় এবং ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়ার মতো মানসিকতা লালন করে।

আমরা জানি সমবায় একটি জনকল্যাণ আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড। যার মধ্যে গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা, সদস্যদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয় নিহিত রয়েছে। এতে করে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে।

অতীতেও মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে নিজেদের জীবন ও জীবিকার পথ সৃষ্টি করেছে। অতীত ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যায়- সৃষ্টির শুরু থেকে পিপীলিকার দল বেঁধে খাদ্য আহরণ, মৌমাছির মধু সংগ্রহ, বন্য পশুর হিংস্রতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ- এসব থেকে মানুষ শিখেছে—সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার। আদিম যুগের গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ ও বন্যপশু শিকারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে এসেছিল এবং বন্যপশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা একসাথে বসবাস

করেছিল।

মানুষের প্রতি মানুষের সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করা—এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের হাতিয়ার হচ্ছে- সমবায়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় বর্তমানে মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য সময়োপযোগী হাতিয়ার। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুসম বণ্টন, উৎপাদনমুখী কার্যক্রমসহ স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের যেকোনো গ্রাম-গঞ্জে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। সমবায় আইনের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করা যায়। স্বল্প আয় ও বেকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার এবং এখনই উপযুক্ত সময়। কেননা বর্তমান এ ক্রান্তিকালে সমবেত উদ্যোগ ছাড়া বিকল্প কিছু থাকে না। জনসংখ্যার আধিক্য, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর সারাবিশ্বে মহামারি করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত ইত্যাদির কারনে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে। কলকারখানাসহ পোশাক শিল্পে কর্মচারী ছাঁটাই, বিদেশ থেকে ফিরে আসা শ্রমজীবী মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখতে গ্রামগঞ্জে,শহরে-বন্দরে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে সমবায়ভিত্তিক কার্য্যক্রম গ্রহণ করে জীবন ও জীবিকার পথ সৃষ্টি করতে হবে। সমবায় সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের জমাকৃত মূলধনকে উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করতে হবে। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতির নিজস্ব পুঁজিতে মৎস্যচাষ, হ্যাচারি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, পোল্ট্রি ফার্ম, কুটিরশিল্পসহ ছোটখাটো ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে দেশের বর্তমান এ দুর্যোগ মুহূর্তে মহিলা সদস্যদের জন্য ঘরে বসে বিভিন্ন হাতের কাজ যেমন—সেলাই, ব্লক-বাটিক, উল বুনন, সোয়েটার তৈরি, ক্রিস্টাল শো-পিস ইত্যাদি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং এরকম উদ্যোগ বাংলাদেশের প্রতিটি সমবায় সমিতিতে গ্রহণ করা আবশ্যক।

সমবায় মানুষের শুধু জীবিকার পথ সৃষ্টি করে না সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করে। কেননা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু আর্থিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—এটি সমাজের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিচালনা করে থাকে। সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সমবায়কে সম্পৃক্তকরণ এবং সমবায়বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলে সমাজের প্রতিটি স্তরকে সমবায়ের মহিমায় সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এক কথায় সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও বৈষম্য দূর করা। পাশাপাশি সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মানবসমাজকে সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলার জন্য এমন পদ্ধতি দরকার যেখানে সম্পদ আহরণের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকবে, লোভ থাকবে না। মানুষ উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত হবে- তবে বিলাসিতার দিকে নয়। প্রতিটি মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে-পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যে আত্মতৃপ্তি খুঁজবে—এমন সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সমবায় সংগঠন।

সমবায় প্রতিষ্ঠান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকারের অন্যতম সহায়ক ভূথমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশে বর্তমানে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে- যার সদস্য সংখ্যা প্রায় এক কোটির অধিক। সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত এ সমবায়ীরা স্ব-স্ব এলাকায় নিজ নিজ উদ্যোগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ২০২০-'২১ অর্থ বছরের জন্য ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট জাতীয় সংসদে পাস করেছেন। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ থাকলে ও সমবায় খাতে তেমন বাজেট বরাদ্দ দেখা যায়নি। যা হোক বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায়বান্ধব। তিনি সমবায়ীদের উন্নয়নে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমার বাড়ী—আমার খামার,সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, পল্লি জীবিকায়ন, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংক সৃষ্টিসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল-সমবায়ভিত্তিক সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন। তাই ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল—সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর স্বপ্ন, শোষণ-বঞ্চনা দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী তাঁর মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণে গ্রামগঞ্জের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমবায়কে বেগবান করে তোলার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন।

উৎপাদন হচ্ছে- উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। সুতরাং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে এবং প্রতিটি সমবায় সমিতিকে উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারলে উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা সম্ভব। এতে করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার পথ উন্মুক্ত হবে। উন্নত জীবন লাভের পথ প্রশস্ত হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। সবাই একে অন্যের মৈত্রী ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

পরিশেষে সমবায়ের যে প্রবাদ—দশের লাঠি-একের বোঝা। এ প্রবাদ বাক্যটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সম্মিলিত প্রয়াস কোনোদিন ব্যর্থ হয় না। সম্মিলিত প্রয়াসে মানুষের সৃজনশীল শক্তির বিকাশ ঘটে।

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—করোনা ভাইরাসে ভয় নয়, আতঙ্ক নয়, নিজে সচেতন থাকুন। ঘরে থাকুন আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করুন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত জেলা সমবায় কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ প্রাপ্ত শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতি ও সমবায়ীর তালিকা

শ্রেণিভিত্তিক সমবায়	সমবায় সমিতি/সমবায়ীর নাম ও ঠিকানা
কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়	**আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ** গ্রাম : রামকৃষ্ণপুর (আমভিটা), ডাকঘর : থুকড়া, উপজেলা : ডুমুরিয়া, জেলা : খুলনা।
সঞ্চয় ও ঋণদান	**তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবণ, মাদার তেরেজা সরণী তুমিলিয়া মিশন পোষ্ট : কালীগঞ্জ, উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর।
দুগ্ধ সমবায়	**দিবস চন্দ্র ঘোষ** **সভাপতি, জেয়ালা ঘোষপাড়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম : জেয়ালা, ডাকঘর : জেয়ালা নলতা, উপজেলা : তালা, জেলা : সাতক্ষীরা।
মহিলা সমবায়	**সততা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ** সাং : বাড়ী নং-৬৬১, রোড নং : ১৪/এ, আদাবর থানা : মোহাম্মদপুর, জেলা : ঢাকা।
বহুমুখী সমবায়	**নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ** ভবানীপুর, পার-নওগাঁ, নওগাঁ।
মৎস্য সমবায়	**চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিঃ** সাং : মাছঘাট বড় স্টেশন, পোষ্ট : চাঁদপুর, উপজেলা : চাঁদপুর সদর, জেলা : চাঁদপুর।
মুক্তিযোদ্ধা সমবায়	**যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুনর্বাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ** সাং : ১/৩, গজনবী রোড, কলেজগেট, মোহাম্মদপুর।
বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়	**পূর্ববস্তি ভূমিহীন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ** সাং : পূর্ববস্তি শহীদবাগ, ১২/ডি, পল্লবী, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।
যুব বিশেষ শ্রেণী ও অন্যান্য পেশাজীবি সমবায়	**দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ** সাং : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া তেজগাঁও, জেলা : ঢাকা-১২১৫।
কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিবহণ শ্রমিক সমবায়	**বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ** সাং : পলওয়েল ভবন, ৬৯/১,নয়াপল্টন, জেলা : ঢাকা।

১৭ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মদিনে সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

১৭ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মদিনে সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ী ও সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সমবায়ীদের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এর নেতৃত্বে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডার এসোসিয়েশন কর্তৃক পুষ্পমাল্য দান।

কক্সবাজারে বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরাম-২০১৯ এর ‘টেকসই ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য সুশাসন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

রংপুরে কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ পরিচালিত ‘গুড হেল্‌থ হাসপাতাল’ পরিদর্শন করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

মুন্সীগঞ্জে সমবায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

বগুড়ার জিনিয়াস মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শনে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

একশত মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও একশ পাউন্ডের কেক কেটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মদিন উদ্‌যাপন। কেক কাটছেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

জাতির পিতার শততম জন্মদিনে সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান : প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

SAMABAYA ● Special Issue, November 2020 ● Price Tk 10.00 ● Regd No. DA-41

বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা...

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam